সতী-প্রতিভা।

নদের নিমাই, বামা-ক্ষেপা, রামপ্রসাদ, দরাফ খাঁ, তুলসীদাস, শক্তি-সাধনা

উপন্যাস-গ্রন্থাবলী, মোহন মালা, বন্ধন-মুক্তি, পীরের আস্তানা,

সতী-কাহিনী, নষ্টচরিত্র, সতীর চিতা, বর্ণাশ্রম,

সংসার-চক্র, মায়ার খেলা, পঞ্চরত্ন

প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণেতা

এবং

সাপ্তাহিক বিশ্বদূত, বিশ্বজননী,

"আলোচনা" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৩৩৫ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

উৎসর্গ পত্র

পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র,

"অমৃত বাজার পত্রিকার" অন্যতম সম্পাদক,

আমার পরম হিতৈষী সুহৃদ

শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ।

মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয়তম পীযূষবাবু!

এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের উন্নতির জন্য আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন, যাহাতে আমার আর্থিক উন্নতি হয়, সে বিষয়ে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না; নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমার মত অকৃতি বন্ধুর জন্য আপনি অনেক সময় অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আপনার সে ঐকান্তিক ভালবাসার প্রতিদান দিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আজ সাহিত্য-কাননের একটী সামান্য কুসুম আপনার করে সমর্পণ করিলাম, ইহার আঘ্রাণে আপনি কিছুমাত্র সুখবোধ করিলে, পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।
১০৫ পঞ্চাননতলা রোড,
দক্ষিণ ব্যাঁটরা—হাওড়া।
৮।৩।৩৫

বিনীত
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আজকাল উপন্যাসের আদর সর্ব্বত্র। বাহিরে যত না হউক, বাঙ্গালীর ঘরের মধ্যে মা লক্ষ্মীদিগের নিকট ইহার আদর বেশী; এইজন্য তাঁহাদের হাতে দিবার মত উপন্যাসগুলি যত শিক্ষাপ্রদ, যত ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং হিন্দুর ঘরের আদর্শ-ভাব সম্পন্ন মনোরম করিয়া প্রকাশ করা যায়—ততই মঙ্গল। "সতী-প্রতিভায়" তাহাই করা হইয়াছে। হিন্দুর আদর্শ গৃহচিত্র কিরূপভাবে গঠিত করিলে আমাদের জননী, ভগিনী, কন্যা, গৃহিণীর নিকট সমানভাবে সমাদৃত হয় এবং বালক ও যুবকগণের আদর্শ চরিত্র সংগঠন করা যায়, ইহাতে তাহা অঙ্কিত করিতে কোনরূপ ত্রুটী করি নাই।

আমার যাবতীয় সাধক জীবনী ও ধর্ম্মমূলক উপন্যাস সমূহ সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট এতাবৎকাল বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে প্রত্যেক পুস্তকেরই তিন চারিটী করিয়া সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। আমার মত হীনমতি গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এক্ষণে "সতী-প্রতিভার" সেইরূপ আদর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী।
১০১ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া
২৫শে শ্রাবণ, সন ১৩৩১।

বিনীত
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বারের কথা।—

নানা প্রকার দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে কিছু বিলম্ব হইল—গ্রাহকগণ তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। হিতবাদী সংবাদ পত্র ইহার প্রথম সংস্করণ বিক্রয় জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

সতী-প্রতিভা

১

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত রুদ্রপুর এক সময় রুদ্ররাম মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে খুব প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। রুদ্ররাম অর্থের জন্য বা ভূসম্পত্তির জন্য এত প্রখ্যাত বা বড় হন নাই। তিনি বড় হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ্যে, ব্রাহ্মণের আরাধ্যধর্ম্মকর্ম্ম সাধনে। সময়ে সময়ে তাঁহার ঐশী শক্তি প্রভাবে দেশের অনেক অমঙ্গল, অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীভূত হইত বলিয়া নবাব-সরকার হইতে তিনি সম্মানসূচক রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্ররাম রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাও কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, তিনি জীবনে কাহারও মন্দ করেন নাই, যতদূর সাধ্য ভালই করিয়াছেন বলিয়া ভয় কাহাকে বলে—তিনি জানিতেন না। পাপেই হৃদয় সন্ত্রাসিত হয়—ভয় উদ্ভূত হয়, যাঁহার হৃদয়ে পাপ নাই, তাঁহার ভয় কিসের? তিনি এবিশ্বে এক মা বিশ্বেশ্বরীকে

জানিতেন আর তাঁহাকেই ভয় করিতেন। তাঁহার বংশের সকলেই এই-রূপ মা-ময় প্রাণ ছিলেন বলিয়া সতত নির্ভীক হৃদয়ে কাল যাপন করিতেন কিন্তু কালের কুঠারাঘাতে সেই প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র বংশ একপ্রকার নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে; এখন আছেন—কেবল একমাত্র হরিশ মুখুয্যে, তিনিও আবার কলিকাতাবাসী হইয়াছেন।

আর সে দিন নাই, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আর দিন চলে না। অর্থ বলই এখন প্রবল হইয়াছে, প্রতিদিন রাত্রি পোহাইলে অর্থ না হইলে চলে না। তখনকার মত আদান-প্রদানে এখন সংসার চলা দায় হইয়াছে বলিয়া হরিশ গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়িয়া উপার্জ্জনের আশায় কলিকাতায় আসিয়াছেন—কিন্তু যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে —তাহাতে তাঁহার মত শিক্ষকের স্থান এখানে নাই, কাজেই ব্রাহ্মণ ভাবিয়া ভাবিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

বহুদিন রোগ ভোগের পর হরিশ মুখুয্যে মহাশয় যখন তাঁর পল্লী-ভবনে আসিয়া দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁর বয়স হইয়াছিল পঁচাত্তর বৎসর। ব্রাহ্মণ সামান্য ইংরাজী শিখিয়া গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তখনকার কালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেরূপ বেতন ছিল, তাহাতে ভালরূপ উদরান্নের সংস্থান হইত না, তাই বড় হইয়া বংশের মানমর্য্যাদা বৃদ্ধির আশায় মুখুয্যে মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছিলেন—কিন্তু অদৃষ্টে অর্থ না থাকিলে লাভের আশা কোথায়? এইজন্য সেখানে কিছুই করিতে পারেন নাই। তবে দেশে কিছু জমি-জমা ছিল বলিয়া তাঁহার সংসার দুঃখে কষ্টে এক প্রকার চলিয়া যাইত।

পত্নী সিদ্ধেশ্বরীদেবী স্বামীর এই সামান্য আয়ে ও জমিজমার উপস্বত্বে এবং উৎপন্ন ফল শস্যে দুঃখের সংসার নিজ পরিপক্ক হস্তের গৃহিনীপণায় বেশ সুখের করিয়া চালাইয়া লইতেন। হিন্দুর দুই একটা ছোট বড় কাজকর্ম্মও বাদ যাইত না; অতিথি অভ্যাগত এই বিপ্র-গৃহ হইতে বিরস বদনে ফিরিয়া যাইত না।

ব্রাহ্মণের সংসার খুব বড় ছিল না। স্বামী স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রমণীমোহন ;—সে গত বৎসর গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার কলেজে এফ এ, পড়িতেছে। এই সামান্য আয়েও পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া বিদ্যা শিখাইতে তাঁহারা একদিনের জন্যও ত্রুটী করেন নাই; যারপর নাই কষ্ট হইলেও পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে কোন্ মাতাপিতা না চেষ্টা করেন? কিন্তু স্বামী-বিয়োগের পর সিদ্ধেশ্বরী বিষম ভাবনায় পড়িলেন।

রমণীমোহন খুব ভাল ছেলে—সকলেই তাহার সুখ্যাতি করে—হরিশ বাবু এই জন্য না খাইয়াও পুত্রের কলিকাতার খরচ যোগাইতেন, রমণীও খুব কষ্টে, যে টুকু না হইলে নয়, ঠিক সেই টুকু মাত্র খরচ লইতেন, অন্যান্য বালকের মত বিলাসিতা তাহার ছিল না। পিতা স্বর্গগত হইবার পর পুত্র বিরস বদনে আসিয়া মাকে বলিল—মা! আর ত কলিকাতায় পড়া হইবে না; এখন গ্রামে থাকিয়াত একটা কাজকর্ম্ম করিতে হইবে; তা কি করা যায়—বল?

স্বামী স্বর্গ-গত হইবার পর এত দিনের একটা প্রগাঢ় ভালবাসার চিরবিচ্ছেদে পতিব্রতার প্রাণ যে কিরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল, তাহা

সহজেই বিবেচ্য ; তার পর পুত্রের ভাবনা। এত অল্প বয়সে তাহাকে লেখা পড়া ছাড়াইয়া ঘরে বসাইয়া রাখিলেই বা কি ফল হইবে ; সেত এখন কোন কাজের উপযুক্ত হয় নাই ! ছুধের ছেলে হাসি-খেলায় দিন কাটায়, এখন হইতে সংসার-চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কোরকে কীটের মত অতি সত্বর তাহাকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিবে—ভাবিয়া ভাবিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে এ কুল ওকুল দুকুল যাইবে—কোনও কুলই রক্ষা হইবে না ! বিশেষতঃ কর্ত্তার বড় ইচ্ছা ছিল—রমণী ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখে, দশ জনের একজন হয়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করে। তবে এখন আমি জীবিত থাকিতে তার সে উন্নতিতে বাদ সাধিব কেন ? কর্ত্তাই চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি ত সঙ্গে করিয়া কিছু লইয়া যান নাই, দশটা নয় পাঁচটা নয়—একটা ছেলে, দেখাই যাক না, কতদূর কি হয় ? মাতা বলিলেন—বাবা ! তোর অত ভাবনা চিন্তার দরকার কি ? এখন ত আমি বেঁচে আছি ; সংসার খরচ ও বেশী নয়—সমস্ত জমিজমা বিক্রয় করিয়াও না হয়—তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিব, তুমি যেমন পড়িতেছিলে—সেইরূপ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া কর, খরচের অভাব হইবে না। তিনি ত আমাদের পথে বসাইয়া যান নাই, যাহা হউক, সাধ্যমত কিছুত রাখিয়া গিয়াছেন, তবে আর ভয় কি ?

জননীর আশ্বাস বাক্যে পুত্রের প্রাণ উৎসাহপূর্ণ হইল। সে বুঝিল—পিতা গিয়াছেন, মাতা ত আছেন—এ জগতে যার মা আছে, তার ভাবনা কি ? পুত্র পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ করত একমাস পরে কলিকাতায় আসিয়া আবার নিজ পাঠে

মন দিল। সমস্ত বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যখন সুখ্যাতির সহিত এফ, এ পাশ করিল, সিদ্ধেশ্বরী যখন তার কৃতকার্য্যতার বিষয় টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার সুখে ও দুঃখে হৃদয় ভরিয়া উঠিল —হায়! কর্ত্তা যদি এ সময় বর্ত্তমান থাকিতেন—তাহা হইলে এই অত্যধিক সুখ দুইজনে ভাগ করিয়া উপভোগ করিলে কত আনন্দের হইত? সিদ্ধেশ্বরী যুক্ত-করে স্বামী-দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রু-পুর্ণ হৃদয়ে স্বর্গ হইতে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

রুদ্রপুরে যখন সকলে রমণীমোহনের পাশের খবর শুনিল—তখন সকলেই অভাগিনী স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা সিদ্ধেশ্বরীর সুখে সুখানুভব করিল। কেবল যাহারা রমণীর সমপাঠী ছিল, তাহার সহিত প্রতি-যোগিতায় যাহারা পিছু হটিয়া পড়িয়াছিল, এ শুভ সংবাদ তাহাদের জনক জননীর প্রাণে তত আনন্দ দান করিতে পারিল না; তাহারা হিংসা-বিসে মরমে মরিয়া গেল, প্রকাশ্যে অখ্যাতি করিতে না পারিলেও অলক্ষ্যে বলিল—পাশ টাশ কি জান—অদৃষ্ট, তবে শেষ রক্ষা করে কিছু উপায়-উপার্জ্জন কর্ত্তে পারে, তবে ত বুঝিতে পারি? যার যেমন মন, সে সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেও মোটের উপর বিধবা সিদ্ধেশ্বরীর সৌভাগ্যে অনেকেই সুখী হইয়াছিল, রমণীমোহনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিল।

"দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিত" এই প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া পুনরায় কলেজে ভর্ত্তি হইতে পত্র লিখিলেন, আনন্দপূর্ণ উৎসাহ দান করিয়া বলিলেন—বাবা! তাঁর আশীর্ব্বাদে

তোমার কোন কষ্ট হবে না, সত্বরই আবার আমরা সুখের মুখ দেখ্তে পাবো।”

তুমি লেখাপড়া শিখিলে এ অবস্থা কত দিন থাকিবে? বাস্তবিক গৃহে অজস্র ধন সঞ্চিত আছে, অথচ বংশের পুত্রগণ মুর্খ হইতেছে। ইহাকে সুসময় না বলিয়া দুঃসময় বলাই উচিত। কারণ অতি শীঘ্র সেই সঞ্চিত ধন মুর্খ পুত্রের দ্বারা নষ্ট হইয়া ভীষণ দুঃখ-দাবানলের সৃষ্টি হইবে, সংসার ছারক্ষার হইবে। আর যদি সংসারে কষ্টের একশেষ হয়, অথচ ভাবী বংশধরগণ উত্তরোত্তর শিক্ষিত ও মার্জ্জিত চরিত্র হইতেছে দেখা যায়, তখন সে বংশের উন্নতি সাধিত হইতেছে, সুখ-সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইতেছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অচিরেই যে তাহারা ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সংসারের দুঃখ দুর্দ্দশা নাশ করিবে, অচিরেই যে তাহারা বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণীমোহন জননীর অনুমতি পত্র পাইয়া মেট্রোপলিটন কলেজে বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

২

বল্লালী প্রথা যখন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যখন কৌলিন্য প্রথা বঙ্গদেশের অস্থিমজ্জায় জড়িত হইয়া আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, যখন দেশের লোক একজন কুলীন নামে পরিচিত ব্রাহ্মণের করেবিশ পঁচিশ বা ততোধিক যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য

জ্ঞান করিতেছে, সেই সময় করুণাময় বন্দোপাধ্যায় নামক কুসুমপুরের একজন কুলীন ব্রাহ্মণ আপন কন্যা প্রভাবতীকে পূর্ব্ববঙ্গের অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন মুক্ষ্য কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিলেন।

অনাথনাথ স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র; তাই ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আরও কয়েকটী বিবাহ হইয়াছিল, প্রভাবতীকে লইয়া গণ্ডা ভর্ত্তি হইল। অনাথনাথের বয়স বেশী হয় নাই ত্রিশের মধ্যে, বাড়ী ঘর বা জমিজমা তাহার কিছু ছিল না, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন আর কৌলিন্য মূলধন লইয়া কেবল বিবাহ-ব্যবসা করিতেন। যেখানে যে কোনও ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাহাকে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্বরূপ বেশী টাকা গণপণ দিত—অনাথ সেইখানেই বিবাহ করিয়া কিছু দিন থাকিতেন—তারপর অন্যত্র যাইয়া আবার বিবাহ করিতেন। এইরূপে যে তিনি পূর্ণ এক গণ্ডা কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবেন একথা আমরা কোন সাহসে গোপন করিব?

অনাথ খুব বড় কুলীনের পুত্র, আর তাঁহার বেহারাও খুব ভাল, এবং মেধা-শক্তিও যথেষ্ট ছিল, যাহা একবার দেখিতেন বা শিখিতেন তাহা জীবনে কখন ভুলিতেন না, তথাপি তিনি বিদ্যা-শিক্ষায় সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়া পিতার দুরবস্থা হেতু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতা সাবর্ণ চৌধুরীদের বাটী অর্থের লোভে কুল ভাঙ্গিয়া গৃহ জামাতা হইয়াছিলেন; বহুদিন স্বামী-স্ত্রীতে একত্র থাকার পর "হবেনা" "হবেনা" করিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে অনাথনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুন্নাম নরকের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যতদিন মাতাপিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন অনাথনাথ পাঠশালায় আঙ্ক আশ্ব শিখিয়াছিলেন, কাগজ-কলম লইয়া কত আচড় পেচড় কাটিয়া-ছিলেন, তার পর যখন পিতা স্বর্গগত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা জননী যখন স্বামীশোকে সেই পথ অনুসরণ করিলেন, তখন অনাথকে লেখা পড়ার জন্য আর কেহ পীড়াপীড়ি করিল না, অভিভাবক মাতুল মহাশয় বলিলেন—ওকে ত আর কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিয়া পেট চালাইতে হইবে না ; যে কুলীনের ছেলে, তাহাতে ও কৌলিন্য বলে বিবাহ করিয়াই রাজার মত কাল কাটাইতে পারিবে—তবে আর বৃথা পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট করিয়া ফল কি ?

কাজেও তাই হইল। অনাথের বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই বিবাহ হইতে আরম্ভ হইল, আর এখন ত্রিশ বৎসর উর্দ্ধীর্ণ হয় হয় তথাপি তাহার বিরাম নাই। ইহার উপর মান সম্ভ্রমও যথেষ্ট ; অনাথ যে শ্বশুর বাটী গিয়া পা ধুইবে—তথায় তাহার মর্য্যাদা চাই ; পত্নী সহবাসের সময়ও প্রণামী না হইলে গৃহে প্রবেশ করিবেন না, তার পর চোব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় আহার ত আছেই। অনাথকে অনেক স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হয়, পরিশ্রম বেশী করিতে হয় বলিয়া একটু একটু কালাচাঁদের প্রেমে মজিয়াছিলেন। প্রত্যহ অর্দ্ধ ভরি আফিম উদরস্থ না করিলে তাঁহার দেহ মেজ্ মেজ্ করিত, তার উপর শিবের প্রসাদেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন না, দিনান্তে পাঁচ ছয় ছিলিম গাঁজা সেবন করিয়া শিব নেত্র হইয়া থাকিতেন। তবে শিবের পত্নী মা কালীর উপাসনা তিনি করিতেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না : এ বিষয়ে তত সুবিধা হইয়া উঠিত না বলিয়া সর্ব্বক্ষণ

তাহার রসআস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতেন, একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলিতে পারি। তবে এ কথাও ঠিক যে তিনি এটা খাবোনা, ওটা খাবোনা বলিয়া আব্‌দার ধরিতেন না; গৃহস্থ ঘরের ছেলের মত যখন যে যাহা সম্মুখে ধরিত, অম্লান-বদনে—লক্ষ্মী ছেলেটীর মত তিনি তাহাই উদরস্থ করিয়া ফেলিতেন।

এই মহারথী কুলীনের পদার্পণে গৃহ পবিত্র হইত, গৃহস্থ ধন্য হইত। যাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি যে কত ধন্য হইয়াছেন—তাহা বলা যায় না, আর কন্যা স্বামীর আদর-আপ্যায়ন না পাইলেও যে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন—তাহা বলাই বাহুল্য। এ হেন স্বামীর সহবাস—সুখ লাভ করিতে পারিলে তাহার যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, তবে এ আকাঙ্ক্ষা বিনা অর্থে পূর্ণ হইবে না। তাই অনাথ যেখানে প্রণামী পাইতেন, খাতির যত্নের ত্রুটী হইত না, যে শ্বশুর বা শাশুড়ী বড় লোক—তিনি দর দস্তুর করিয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই তিন মাস সেইখানেই কাটাইয়া আবার অন্যত্র যাইতেন। সহজে যাঁহার এত উপার্জ্জন—তাঁহার লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া শরীর নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবতীর বিবাহ দিয়া অনাথনাথকে প্রায় দুই তিন বৎসর গুরুর আদরে গৃহে রাখিয়াছিলেন; দেবতার মত পূজা-ভোগ দিবার কিছু মাত্র ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু মানুষের অবস্থাত চিরদিন সমান যায় না? বার্দ্ধক্য হেতু তাঁহার অর্থাগম কম হইতে লাগিল—তাই দেবকল্প জামাতাও বিরূপ হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। তাহাদের এই অসময়ে ভুলিয়াও একবার দেখা করিতে আসিলেন না।

খবর না পাওয়ায় প্রভাবতীর খুব বেশী বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এবং পিতা কুলীনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন বলিয়া অনাথ টাকার লোভে প্রায়ই কুসুমপুরে যাওয়া আসা করিতেন। এই জন্য অদৃষ্ট ক্রমে প্রভাবতীর পারুলফুলের মত একটী সুন্দরী কন্যারত্ন লাভ হইয়াছিল। অনাথনাথ অতি সুপুরুষ এবং সুঠাম-গঠন, প্রভাবতীও ভদ্র গৃহস্থের মত রূপবতী ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের কন্যা যে সুরূপা এবং পরমাসুন্দরী হইবে—তাহার আর বিচিত্র কি?

করুণাময় রোগশয্যায় শায়িত—উপায় করিবার ক্ষমতা নাই. সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, বহুদিন রোগভোগে এবং কন্যা জামাতার প্রতিপালনে ক্রমে ক্রমে তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। প্রভাবতী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, কিন্তু কোথা তিনি? তাঁহার কোন স্থানে থাকিবার ত স্থিরতা নাই, যে দুঃখ জানাইয়া পত্র লিখিবেন। কখন কোন্ শ্বশুর বাড়ী থাকেন, কোন ভাগ্যবতীর গৃহ উজ্জ্বল করেন, তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে, কাজেই স্বামীকে সংবাদ দিতে পারিলেন না।

ক্রমে অন্নাভাব হইবার উপক্রম হইল। রুগ্ন পিতার পথ্যের কোন সংস্থান নাই, আপনি খাইতে পাই আর না পাই, পিতার এই দুঃসময়ে কোন কষ্ট না হয় এবং এই অপোগণ্ড শিশু-পুত্রীটী আহার অভাবে মারা না যায়, প্রভাবতী এক্ষণে ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জননী বহুদিন হইল স্বর্গগতা হইয়াছেন, কাজেই এক্ষণে তিনি ভিন্ন পিতাকে দেখিবার ও সেবা করিবার আর কেহ নাই বলিয়া বুঝি ভগবানের কর্ণে তাঁহার সে প্রার্থনা পৌঁছিল। প্রভাবতীর যখন এই

অবস্থা, তখন পাড়ার দুই একজন বদান্য গৃহস্থ তাঁহার দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিয়া কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহও যে না হইল—এমন নহে। কলিকাতার ছাত্রাবাসে, কলেজে ইঁহাদের দুরবস্থার কথা উঠিল, অনেক বদান্যবর শিক্ষিত ছাত্র স্বইচ্ছায় জলখাবার পয়সা বাঁচাইয়া ইঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। মেট্রোপলিটন কলেজে চাঁদা কিছু বেশী উঠিত, এ চাঁদার সংগ্রাহক আমাদের পূর্ব্বোক্ত পরোপকারী যুবক রমনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

পিতার পথ্য দান ও কন্যাটীকে আহার প্রদান করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, প্রভাবতী তাহাতেই বহু কষ্টে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কয়েকটী বালকের চেষ্টায় আর কত হইবে? যাহা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট, ভাবিয়া ভাবিয়া প্রভাবতীর তেমন যে সুন্দর বর্ণ, সুঠাম গঠন ক্রমে ক্রমে কঙ্কাল সার ও মসীবর্ণ ধারণ করিল, তথাপি তিনি পিতার এই শেষ সময়ে একদিনের জন্য সেবাযত্নের ক্রটী করিলেন না।

৩

করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেন। ধাত্রী চিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এই জন্য বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে তাঁহার মন কেমন উদাস হইয়া গেল, প্রাণ কেমন দমিয়া গেল, আর তিনি চিত্ত-স্থির রাখিয়া

কলিকাতায় উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। অনাথনাথের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া বিষম দায় হইতে মুক্তি লাভ করত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুসুমপুরে নিজ জন্মভূমিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জন-কোলাহল-পূর্ণ কলিকাতা সহরের গাড়ী-ঘোড়ার সে ঘোর ঘর্ঘর শব্দ, তাহার সেই শীতলতা বিহীন উষ্ণ বাতাস তাঁহার আর ভাল লাগিল না; তাই পল্লীজননীর শ্যামলশষ্প, তরুলতার ছায়া, শীতল বাতাসে, নির্জ্জন গৃহভবনে আসিয়া শেষের গণা দিনকটা যাপন করিতে ইচ্ছা হইল।

সংসার বেশী নহে—একটা মাত্র কন্যা, আর সৌভাগ্য ক্রমে কুলীন জামাতাটীও যদি ঘাড়ে পড়ে, তাহা হইলে যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে বড় একটা অভাব হইবে না। প্রভাবতীর গর্ভে যদি দুই চারিটী সন্তান-সন্ততিও হয়, তাহা হইলে দেশের জমিজমার চাষ-আবাদে যখন একপ্রকার চলিয়া যাইবে, তখন আর কেন বিদেশ-বিভুয়ে ডাক্তারী করিয়া শেষ দশায় এত বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করি। এই মনে করিয়া আজ দুইবৎসর হইল—করুণাময় দেশে আসিয়াছেন। অনাথনাথও প্রণামীর লোভে সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়ের অন্ন-ধ্বংস করিতেছেন; কিন্তু এমন সুন্দরী কন্যাটী হইয়াছে, তাহার জন্য যে কখন একপয়সার মিষ্টান্ন আনা, বা একটা খেলনা আনিয়া সন্তুষ্ট করা তাহা তিনি কখনও করিতেন না; তথাপি করুণাময় ও প্রভাবতী ভয়ে ভয়ে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেন, পাছে অনাথ পলাইয়া যায়—আর না আসে। তখন কুলীন জামাতার নিকট দরিদ্র শ্বশুর-খাশুড়ী ও পত্নীর এইরূপ হীনতা স্বীকার ভিন্ন আর উপায় ছিল না।

এত হীনতা স্বীকার করিয়াও কিন্তু স্বার্থপর অনাথের মন পাওয়া গেল না। ভ্রমর যখন দেখিল—মধু শুকাইয়াছে, অর্থের অনাটন হইয়াছে, চাহিলে আর কিছু পাওয়া যায় না, খাওয়া-পরারও কষ্ট, তখন সে ভিন্ন ফুল অনুসরণ করিতে চলিয়া গেল।

গ্রামের যাহারা স্থানান্তরে যাওয়া আসা করিত, করুণাময় তাহাদের সকলকেই বলিয়া দিয়াছেন—যদি অনাথনাথের সহিত কোথাও দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আমার অবস্থা জানাইয়া তাহাকে একবার আসিতে বলিও, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই তাঁহার দেখা পায় নাই—অনাথও আর এ মুখো হন নাই।

কলিকাতায় অবস্থান কালে মেট্রোপলিটনের ছাত্র রমণীমোহন করুণাময়ের দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। সে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এ সময়ে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠায় কিন্তু পরের দেওয়ায় আর ক'দিন চলে, বিশেষতঃ ছাত্র জীবনে একজন দরিদ্র যুবকের চেষ্টায় আর কত হইবে? রোগ যে বহুদিন ব্যাপী, পথ্য খরচও যে তার অনেক, এ সময় তাঁহার যেরূপ খাইতে ইচ্ছা হয়—পরে কি আর তাহা যোগাইতে পারে? এ সকল নিজের অর্থ-সাপেক্ষ, তথাপি প্রভাবতী এ বাড়ী ও বাড়ী ভিক্ষা করিয়া একটু আধটু দুধ, পুকুরের ধরা মাছ আনিয়া পিতাকে খাওয়ান, তাহাতে রোগী এতদিন ধরিয়া যাহা একটু যুঝিতেছিল, তাহাও আর থাকে না, এই জন্য করুণাময় কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি মনে করিয়াছিলেন সঞ্চিত অর্থে একপ্রকার চলিয়া যাইবে; কিন্তু অদৃষ্টে কষ্ট থাকিলে—কে তাহার খণ্ডন করিবে?

তিনি এখন নিজের ভাবনা না ভাবিয়া কন্যার চিন্তাতেই দিন দিন

ম্রিয়মাণ হইতেছেন, রোগও ক্রমশঃ জড়াইয়া ধরিতেছে—আর উত্থান-শক্তি রহিত, গেলেই হয় কিন্তু পুত্রী ও দৌহিত্রীটীর উপায় কি?

প্রভাবতী পিতার দুশ্চিন্তার কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—বাবা! আপনি এ সময় অন্য চিন্তা না করিয়া ভগবানের চিন্তা করুন, আমাদের অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভোগ করিতেই হইবে, আমাদের জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া আপনি পরকাল নষ্ট করিবেন কেন?

কিন্তু মন কি তাহা বুঝে? মায়ার টানে মানুষ এই সময়েই যত বাহিরের চিন্তা করিয়া থাকে। সাধনায় চিত্ত স্থির না হইলে, ঈশ্বরে স্থির-বিশ্বাস না আসিলে, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া মানুষ কিছুতেই এসময় স্থির হইতে পারে না, করুণাময়ও পারিলেন না, তবে সেই দিন হইতে এক একবার ইষ্ট নাম করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন—"ছার কৌলিন্যে জলাঞ্জলি দিয়া মা যদি তোকে একটা ভাল ছেলের হাতে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে এ সময় তোর চিন্তা আর আমাকে এত কাতর করিতে পারিত না। এসময় তোর মেয়ের চিন্তাও আমার এক মহাচিন্তা হইয়াছে, অনাথ ত ফিরেও চাহিল না, তবে অনাথিনী তুই কেমন করিয়া উহাকে সৎপাত্রে অর্পণ কর্ব্বি—আমিত কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।"

প্রভাবতী অলক্ষ্যে চক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন—বাবা! ও যখন জন্মেছে, তখন ভগবান ওর একটা কিনারা করে রেখেছেন, তুমি কেবল ঐ চিন্তা করে রোগটাকে বাড়িওনা। ভগবান আছেন—একটা উপায় করবেনই; কে আর অবিবাহিত হয়ে কাল কাটিয়েছে? তবে গৌরী

গরীবের মেয়ে হয়েও দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে এর মধ্যেই যেন বিয়ের যোগ্যী হয়েছে— ওর গড়নটা এমনি বাড়নসা।

"হাঁ মা! তাই বল্‌ছি—ওর জন্যে এক পয়সাও রেখে যেতে পারলেম না—উপায় কি হবে? বাবাজী যে আর নেক্ নজর কর্ব্বেন, তা বলে ত বোধ হয় না—কুলীন গুলোর বিবেচনাই এইরূপ, পিতা পুত্রীতে অপার ভাবনায় সমুদ্রে ডুবিয়া পড়িলেও প্রভাবতী পিতার শেষ দশায় এসকল চিন্তায় আকুল করিতে চাহেন না, অদৃষ্টবাদিনী অদৃষ্টের প্রতি চাহিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন।

৪

অর্থাদি সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে। সঞ্চিত ধন খরচ করিলে আর কত দিন থাকে? তাহাতে যোগ না হইলে ক্রমশঃ বিয়োগে কুবেরের ভাণ্ডার যখন ফুরাইয়া যায়, তখন করুণাময় বাড়ুয্যের সামান্য দুই এক হাজার টাকা আর কতদিন থাকিবে? টাকা সমস্ত ফুরাইয়া যাইলেও করুণাময়ের পথ্যাদি বা চিকিৎসার কোন ক্রটী হয় নাই। দামু ঘোষ নামক গ্রামের একজন উগ্রক্ষত্রিয় কৃষক—সে করুণাময়ের প্রতিপালিত ছিল, প্রভাবতীকে সে ভগ্নীর মত ভাল বাসিত, সময়ে সময়ে আসিয়া দেখিয়া যাইত, অথবা আবশ্যক হইলে প্রভাবতী যাইয়া ডাকিয়া আনিলে কিম্বা সংবাদ দিলেও সে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আসিতে কাতর হইত না। প্রভাবতীর কন্যা গৌরী প্রায় দামু ঘোষের বাটীতে প্রতিপালিত

হইত। রোগীর সেবার ত্রুটী হইবে বলিয়া দামু ঘোষ তাহাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইত; এবং প্রভাবতীর ও প্রভু করুণাময়ের আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্ত সরবরাহ করিত। পাড়ার বিজ্ঞ কবিরাজ রামধনও করুণার চিকিৎসার জন্য এক পয়সা গ্রহণ করিতেন না। সমব্যবসায়ী বলিয়া তিনি প্রাণপণে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। এক সময় করুণাময়ের দ্বারা তিনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন; তাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে রামধন কবিরাজ করুণাময়ের এ দুঃসময়ে যথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শী করুণাময় কবিরাজ মহাশয়ের কন্যার প্রসবের সময় যাহা করিয়াছেন; কলিকাতা হইতে বিনা পয়সায় আসিয়া যেরূপ পরিশ্রমে কন্যাটীকে বাঁচাইয়াছেন, এজীবনে তাহা ভুলিবার নহে, তাই রামধন তাঁহার এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতিদিন দুই তিন বার আসিয়া অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। রামধন একজন বিজ্ঞ কবিরাজ, হাত যশ খুব ভাল, পুরাতন রোগ নির্ণয়ে তাঁহার ক্ষমতা অত্যদ্ভুত; কিন্তু যাহার কালের ডাক পড়িয়াছে, গণা দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, মৃত্যু যার শিয়রে বসিয়া ভ্রূকুটি করিতেছে—কবিরাজ বা চিকিৎসক তাহার কি করিবে?

রামধনের প্রাণপণ চেষ্টা, দামু ঘোষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভাবতীর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেবা শুশ্রূষায় কোন ফল হইল না। রোগ দিন দিন বাড়িবা যাইতে লাগিল দেখিয়া সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন। রোগীর বাক্য-রোধ হইয়া গেল—কিছু দিন নিস্পন্দ ভাবে জীবন্মৃতের মত পড়িয়া থাকিয়া একদিন ভোগের অবসানে করুণাময় প্রভাবতীকে অকুল শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

নিরাশ্রয়া প্রভাবতী পিতার মৃত্যুতে ধুলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! অভাগিনী এ জীবনে পিতা ভিন্ন যে আর কাহাকেও জানে না—জীবনে সে পিতার স্নেহ মমতা ভিন্ন, আদর ভালবাসা ভিন্ন আর যে কিছু উপভোগ করে নাই। বাল্যে মাতৃহীনা, মা কেমন বস্তু তাহা সে দেখে নাই; তার পর যদিও কৈশোরে বিবাহ হইল—স্বামীর সোহাগ পাইবার অধিকারিনী হইল—কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে বেশী দিন তাহাকে সে সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিতে হইল না; পরম কুলীন স্বামী টাকার লোভে বিবাহের পর কয়েকবার আসিয়াছিলেন। তখন করুণাময় কুলীন জামাতাকে যথাযোগ্য পূজা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন, এখন পূজার ত্রুটী হইয়াছে, অবস্থাবৈগুণ্যে প্রণামী আর দেওয়া হয় না, কাজেই জামাতা অদৃশ্য হইয়াছেন—আর দেখা দেন না। প্রাণের গৌরী যাহাকে দেখিলে পথের শত্রু ফিরিয়া চায়, তেমন সুন্দরী কন্যাকে অনাথ-নাথ একবার চক্ষের দেখা দেখিতেও আসেন না। প্রভাবতী কত কান্নাকাটী করেন, পদে ধরিয়া নিজের হীনাবস্থার কথা কত প্রাণফাটা দুঃখে নিবেদন করেন কিন্তু অনাথের পাষণ হৃদয় তাহাতে গলে না। তাঁহার এ বিবাহ ত ভালবাসার জন্য নহে, মায়া-মমতা ত এ মিলনে সঞ্চারিত হয় নাই, স্বর্গীয় প্রণয় ত এ বিবাহের উদ্দেশ্য নহে? এ বিবাহ যে স্বার্থ বিজড়িত—তাই স্বার্থের হানি হইলে আর সে আসিবে কেন, তাঁহার ত স্ত্রীর অভাব নাই? যেখানে স্বার্থ-মধু পাইবে, এ ভ্রমর সেইখানেই ছুটিবে, প্রণয়-মধু আহরণের ষট্‌পদ ত সে নয়?

এত নির্যাতনে—এত অপমানে—এত অনাদরে, এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেও প্রভাবতী কিন্তু স্বামীর প্রতি তন্ময় ছিলেন, এরূপ গুণধরকেও তিনি

গুণের আধার পরম দেবতা বলিয়া প্রতি দিন হৃদয় মন্দিরে দেবাসনে বসাইয়া প্রীতির পুষ্পে পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি জানিতেন—অদৃষ্ট মন্দ তাই দেবতা বিরূপ; সময় হইলে, অদৃষ্ট চক্রের ঘোর কাটিলে, আবার সদয় হইবেন। দেবতার তুষ্টি-রুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি পরকাল নষ্ট করিব কেন? যে মেঘে দুর্দ্দিন আনিয়াছে; মেঘ কাটিয়া গেলে, আকাশ নির্ম্মল ভাব ধারণ করিলে, আবার সুদিন আসিবে। প্রভা হিন্দু স্ত্রী, অদৃষ্টের প্রতি তাঁহার এত দৃঢ় বিশ্বাস!

করুণাময়ের শব অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় ও দামু ঘোষ লোকের দ্বারে দ্বারে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শব সৎকারের জন্য লোক সংগ্রহ করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহাকে সুচিকিৎসক বলিয়া ভক্তি করিত—তাহারা আসিল, আর যাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত, এমন সোণার প্রতিমা প্রভাবতীকে একটা মুর্খ পাত্রে প্রদান করিয়া তাহার পরকাল নষ্ট করিয়াছে বলিয়া যাহারা অবজ্ঞা করিত, তাহারা আসিল না, বলিল—কুলীন জামাতা এখন কোথায়? আমরা ত বলেছিলাম—অনাথকে জামাতা করো না; দুঃসময়ে সে ফিরিয়াও দেখিবে না। যে অমন সোণার প্রতিমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে—তার পরিণাম ঐ রকমই হয়। পাড়ার ভবানী মুখুর্য্যের ভাইয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে, আজ কি আর করুণাময়কে অমন দীনহীনের মত মর্ত্তে হয়? কত সাহায্য পেতো, লোকেরও অভাব হতো না।

পাড়ায় কুলীন-মৌলিক লইয়া বিষম দলাদলি ছিল—যাহারা মৌলিক, তাহারা এই কথা বলিল। কবিরাজ ও দামু ঘোষ বলিল—মহাশয়! যাহা হইবার তাহাত হইয়া গিয়াছে—এখন তিনি ত স্বর্গগত হইয়াছেন

—তাঁহার শব দেহের সঙ্গে আর দলাদলি কি? বলিয়া দাদু ও কবিরাজ চলিয়া আসিয়া—অপর দুই একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া শব দেহ শ্মশানে লইয়া গেল এবং যথাবিধি সংকার করিয়া গৃহে ফিরিল।

কুসুমপুরে কুলীনের সংখ্যা বেশী ছিল না; মৌলিকের সংখ্যাই বেশী;—এই জন্য করুণাময়কে শেষ অবস্থায় গ্রামে এক প্রকার বন্ধুহীন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মৌলিকেরা খুব পদস্থ এবং ধনী, আর কুলীন যে কয় ঘর ছিল—তাহারা খুব দরিদ্র, এই জন্য মৌলিকেরা কৌলিন্যের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া করুণাময়কে ভবানী মুখুর্জের ভায়ের সহিত প্রভাবতীর বিবাহ দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, করুণাময়ের যখন পুত্র নাই, তখন আর এত কুল কুল করিয়া মরা কেন? কন্যাকে কুলীনে না করিয়া, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের একজন স্বার্থপর কুলীনের সহিত বিবাহ না দিয়া পাড়ায় বিবাহ দিলেই ভাল হইত। ভবানীবাবু পাড়ার একজন উচ্চ পদস্থ ধনবান লোক, কন্যাটীকে দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু করুণাময়ের পিতা-পিতামহ কখন মৌলিকে কন্যা দান করেন নাই, সমস্তই কুলীনে করিয়াছেন, অতএব পিতৃপিতামহের পন্থা ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া অপরে কন্যা সম্প্রদান করেন? এই জন্য তিনি পাড়ার লোকের অনুরোধ এবং ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই বলিয়া প্রতিবাসী কাহার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না এবং তিনিও কলিকাতার ডাক্তার, ইংরাজী জানাশুনা উপায়ক্ষম ব্যক্তি, তাহাদের তত গ্রাহ্যও করিতেন না। কিন্তু শেষাবস্থায় তিনি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন—কার্য্য ভাল হয় নাই। আমার যখন

সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মেয়ে; আর পুত্রাদি কিছু নাই, তখন কৌলিন্যের প্রতি নজর না রাখিয়া মেয়েটার ভবিষ্যতের প্রতি নজর রাখিলে আর আমাকে শেষ সময় এত ভাবিতে হইত না। ভবানীবাবুর ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিলে সে রাজ-রাণীর মত এখন সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারিত, চারিটী ভাতের জন্য আর পরের দারস্থ হইতে হইত না কিন্তু সে চিন্তায় এখন আর ফল কি? তাই প্রভাবতী বলিতেন—বাবা! আমার চিন্তা ছাড়িয়া আপনি এখন আপনার চিন্তা করুণ, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে—তাহাই হইবে; কপাল ছাড়াত পথ নাই? বিদুষী কন্যা পিতাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতেন, এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর তিনি অদৃষ্ট চিন্তা করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পিতা ত লোকান্তরিত হইলেন,; দারুণ অভাবের প্রভাবে ফেলিয়া তিনিত চলিয়া গেলেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার কি হইবে? গৌরীকে লইয়া প্রভাবতী দিন চালাইতেই অক্ষম, কষ্টে স্বষ্টে প্রাণ ধারণের জন্য দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নই জুটেনা, এঅবস্থায় পিতার শ্রাদ্ধ হয় কিসে, কেমন করিয়া বা অশৌচান্ত হয়? প্রভাবতী ভাবিয়াই

আকুল হইলেন—হিন্দুর নিয়মানুসারে যেমন তেমন করিয়াও ত অশৌচান্ত করিতে হইবে ?

গৌরী তাহার দাদামহাশয়ের কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিল,লবয়সের সঙ্গে সঙ্গে এখন জ্ঞান বুদ্ধিও কিছু পাকলো হইয়াছে,মায়ের কষ্ট দেখিয়া সে বলিল—মা ! দাদামহাশয় বলিতেন "অতুরে নিয়মংনাস্তি" আমাদের যখন খাইবার সম্বল নাই—তখন লোক দেখান শ্রাদ্ধ নাই বা হইল ? আমরা গঙ্গার ঘাটে গিয়া ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে দাদামহাশয়ের পর কালের সদগতি প্রার্থনা করি চল। যাহার পয়সা নাই, তাদের কি আর বাপ্ পিতা মহের উদ্ধার হবে না, তারা কি শুদ্ধ হইতে পার্ব্বে না ?

প্রভাবতী কন্যার কথা শুনিয়া বলিলেন—মা ! কথা ঠিক কিন্তু সমাজে থাকৃতে হলে সমাজের প্রথা মেনে চল্‌তে হবে, অশৌচান্ত না হলে যে কেউ তোমার হাতের জল খাবে না ? গৌরী যেন কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিল—বাস্তবিকই কি সামাজিক প্রথা এইরূপ কিন্তু তথাপি দৃঢ় স্বরে বলিল—মা ! আমরা আর কখন কাকে জল খাওয়াবো যে খাবে না, সে সৌভাগ্য কোথায় ?

প্রভাবতী কন্যার দুঃখজড়িত মুখের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক খেদোক্তি শুনিয়া বলিলেন—মা ! তা কি বলিতে পারা যায়, আমার না হয় অদৃষ্ট এমন মন্দ, কিন্তু তুমিত রাজ-রাণী হইতে পার—তোমার অদৃষ্টত সুপ্রসন্ন হইতে পারে, তখন যে লোকে দোষ দিবে ? তোমার মঙ্গলের জন্য আমাকে ভিক্ষা করেও অশৌচান্ত কর্ত্তে হবে ?

গৌরী বলিল—মা পাড়ার লোকে বিপক্ষ, আমার ভবিষ্যতের জন্য পাড়ার লোকের কাছে তোমায় হাত পাতিতে দিবো না, লোকে কত

ভাল মন্দ বল্‌বে—তা শুনার চেয়ে, ভগবানের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকাই ভাল, বাস্তবিক আমাদের গায়ে ত আর কোন ময়লামাটী লেগে নাই যে শুচি না হলে চল্‌বে না ?

প্রভাবতী বলিলেন—খ্যাপা মেয়ে, পিতামাতার বিয়োগে দেহের ও আত্মার একটা মলিনত্ব বাহ্যিক না হইলেও আন্তরিক হয়ে থাকে, শ্রাদ্ধ সেই মলিনত্ব নাশের উপায় কারণ পিতামাতার দেহের এবং আত্মার সঙ্গে সন্তানের আত্মার যে একটা অকাট্য যোগাযোগ রয়েছে ইহার জন্য শাস্ত্রানুসারে অশৌচান্ত কর্ত্তে তাহারা বাধ্য।

জননীর এই গুরুতর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া গৌরী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, সে বিষয় বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের বিষাদক্লিষ্ট মুখের প্রতি ভাস্বর নয়নে চাহিয়া রহিল। দাদামহাশয়ের অদর্শণে সে প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিল, ঘর-বাড়ী-আচার-ব্যবহার তাহার যেন কিছু ভাল লাগিতেছিল না। হায়! অভাগিনী পিতৃস্নেহ একেবারে বঞ্চিত, জ্ঞান হইয়া অবধি পিতা যে কেমন বস্তু তাহা সে চক্ষে দেখে নাই, স্নেহপ্রবণ অন্তরের অনুভূতি পাওয়াত পরের কথা। কিন্তু করুণাময় অশেষ করুণায় দৌহিত্রী বলিয়া নহে' বুঝি পৌত্রীকেও লোকে এত যত্ন করে না তিনি এই ঘোর কষ্টের মধ্যেও গৌরীকে বিশেষ করিয়া প্রতিপালন করিয়া ছিলেন। সেই দাদামহাশয়ের অদর্শনে বালিকার প্রাণে কিরূপ শোকশেল বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। দাদামহাশয় মারা গিয়াছেন,— তাঁহার জন্য তাহাদের দেহ অশুচি হইয়াছে, সেই অশৌচ নষ্ট করিয়া শুচি হইতে হইবে, শ্রাদ্ধের জন্য পরের দায়স্থ হইয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—এ কথা ভাবিতেও গৌরীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে!

তাই সে মাকে বুঝাইয়া বলিতেছে—ভিক্ষা করিয়া কাজ নাই বরং গঙ্গাতীরে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া শুচি হইগে চল, দাদামহাশয় শাস্ত্রের এ সকল কথা কতবার তোমাকে বলিয়াছেন ত?

মাতা-পুত্রীর বাক্-বিতণ্ডা কিন্তু দামুঘোষের সহ্য হইত না, সে গৌরীকে কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, প্রভাবতীকে সে ছোট ভগ্নীর মত আজীবন দেখা শুনা করিয়াছে, করুণাময় পীড়িতাবস্থায় এই পরম বিশ্বাসী শিষ্যের করে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া মরিয়াছেন। সে কি দাদাঠাকুরের হাতে হাতে সঁপে দেওয়া এই দুইটী প্রাণীকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে? তাই সে দেখিয়া শুনিয়া বলিত—তোরা মায়ে-ঝিয়ে এত ঝগড়া করিস্ কেন, যা হবার তা হবে, তার জন্য আর ভাবনা কি? যেমন অবস্থা সেই রকমই কাজ হবে, উদ্ধারের কর্ত্তা ভগবান আছেন—তাঁর ভাবনা তিনিই ভাবছেন, দাঁড়া না অনাথের সন্ধান পেয়েছি, সে দেবীপুরে ঘোষালদের বাড়ীতে এসেছে, একবার দেখা করে আসি, তার পর যা হয় কর্ব্বো।

উগ্রক্ষত্রিয় যুবক দামুঘোষের প্রাণের তেজ বড় বেশী। পরের জন্য সে সব করিতে পারে, সাদা প্রাণে সে পরের উপকার করিয়া যায়, বিশেষতঃ এই বন্দোপাধ্যায় পরিবারের জন্য সে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে। এইজন্য মন্দ লোকে কত মন্দ কথা কয়, কত সন্দেহ করে কিন্তু দামু ঘোষ তাহাতে দৃকপাত করে না, উপরের দিকে চাহিয়া যে কাজ করে। যার প্রাণের তেজ এত, সে কি কাহারও ভাল-মন্দ কথায় দমিয়া যায়?

দামুঘোষ পর দিন সকাল বেলায় উঠিয়া প্রভাবতী ও গৌরীর

হবিষ্যান্নের উদ্যোগ করিয়া দিয়া, একখানি গামছা কাঁদে করিয়া দেবীপুর যাত্রা করিল। কুসুমপুর হইতে দেবীপুর চারি ক্রোশ পথ, নায়বার খাবার বেলায় সে অনায়াসে তথায় পৌছিয়া গেল এবং ঘোষালদের বাড়ী খুঁজিয়া অনাথনাথের সহিত দেখা করিল। অনাথনাথ তখন সবে মাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া নিজের দেহের তোয়াজ করিতেছিল! দামুঘোষ তাহাকে দেখিয়া, একগাল হাসি হাসিয়া করযোড়ে প্রণাম করতঃ বলিল—দাদাঠাকুর! কেমন আছেন, আর যে বড় কুসুমপুরে যেতে দেখি না? তখন হয়-ঘড়ি সেখানে যেতে, আর এখন পায়-ধুলা দেও না কেন?

অনাথনাথ ঘোষালদের বাহিরের দাওয়ার বসিয়া স্নানের পূর্ব্বে একছিলিম গঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপানের আয়োজন করিতে ছিলেন। এমন সময় দামুকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন—কে ও দামু যে, কোথা থেকে হে! এস বসো বসো?

আসিবার কারণ গোপন করিয়া দামু বলিল—এই দাদাঠাকুর দেবী-পুরের হাটে কিছু জিনিষ বেচিবার জন্য এসেছিলাম, তাই একবার এখানে তাল্লাস করে যাচ্ছি, যদি আপনার দেখা পাই, তা হলে দিনটা সুপ্রভাত হবে, আপনাদের মত লোকের দেখা পাওয়া কতটা সৌভাগ্যের বিষয় বলুন দেখি?

তাতো বটেই দামু! নইলে কি আর লোকে মেয়ে দিয়ে ঘরে রাখবার জন্য এত সাদাসাদী করে? এই বলিয়া অনাথ কলিকায় অগ্নি সংযোগ করত ভোলানাথের নাম স্মরণ করিয়া একটা বিষম দম মারিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিলেন। তুরিতানন্দ গঞ্জিকা সেবনে

স্বর্গ-মর্ত্ত একাকার করিয়া খোলা প্রাণে বলিলেন—হাঁ হে দামু! ও বাড়ীর খপর কি কিছু রাখ, আমার শ্বশুরটা কি এত দিন মারা গিয়াছে? ওঃ কি ভোগটাই ভুগ্‌লে, দু দু বৎসর! এ সমস্ত মহাপাপের ফল আর কি?

দামু মনে মনে এই পুণ্যবান মহাত্মার গলায় দড়ি পরাইতে পরাইতে প্রকাশ্যে বলিল—মহাশয় পুণ্যবান্ তাই চিরদিন পরের স্কন্ধে চেপে আছেন। বাঁড়য্যে মহাশয় আজ কয়েক দিন হইল—মারা গিয়াছেন, এর মধ্যে তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রীর এত কষ্ট যে দিন চলা ভার হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে স্বামীকে ত ভর্ত্তা বলে—স্ত্রীর সকল সময়েই তিনি ভরণ-পোষণের কর্ত্তা এ অসময়ে তাদের না দেখলে কি আপনি মহাপাপী হবেন না?

অনাথ কলিকায় আর একটা দম ভাল করিয়া মারিয়া বলিলেন—দামু! আমাদের কুলীনের ঘরে ওসব নেই; আমরা স্ত্রীকে কখনও প্রতি-পালন করি না, বরং স্ত্রী দ্বারা প্রতিপালিত হই!

দামু বলিল—স্ত্রী যদি বড় লোকের মেয়ে হয় তবেইত আপনি প্রতিপালিত হবেন কিন্তু যদি বিবাহিতা স্ত্রী কোনও প্রকারে কষ্টে পড়ে, তখন কি আপনার দেখা উচিত নয়?

অনাথ। দেখ, আমাদের সে দায়ীত্ব নাই, সে দায়ীত্ব ঘাড়ে লইয়া আমরা বিবাহ করি না। স্ত্রী হাজারই দুঃস্থ হউক, সে আপনার সতীত্ব বিক্রয় করিয়াও আমাদের মানমর্য্যাদা বজায় রাখিবে, স্ত্রী পতিতা হইলেও আমরা তাহার সংস্পর্শে থাকিলে তাহাকে কেহ দুষিতে পারিবে না, এমনি আমাদের কৌলিন্যের তেজ। তুমি প্রস্তাবতীকে

বলো, আমার সে সময় নাই, তবে যদি ঐরূপ কোন প্রকারে সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সংগৃহীত অর্থ লইয়া আমি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছি।

দামু ঘোষের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল, রাগে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, উগ্রক্ষত্রিয় দামু অন্যস্থানে অনাথের মুখে এককথা শুনিলে হয় ত এক চপেটাঘাতেই তাহার বদন বিগ্‌ড়াইয়া দিত কিন্তু এ ভিন্ন গ্রামে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ী, তাই রাগ সাম্‌লাইয়া বলিল—ওঃ আপনার শরীরে এত দয়া ! দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, অম্লান বদনে তাকে সতীত্ব বিক্রয় করিয়া অর্থ উপাজ্জনের পরামর্শ দিয়া, সেই উপার্জ্জিত অর্থে দেহ পুষ্ট করা আপনার ন্যায় পুণ্যাত্মার উদারতার পরিচায়ক বটে। জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কুলীন হইয়া আপনি কোন্ মুখে এ কথা প্রকাশ করিলেন ? ভর্ত্তা হইয়া ভরণ-পোষণের ভার লইতে অসমর্থ হইয়া কোথায় নিজের জীবনে ধিক্কার দিবেন, তাহা না হইয়া সতীকে অসতী হইয়া আপনাকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিবার কথা বলিতে আপনার জিহ্বা খসিয়া পড়িল না ! এত লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হইয়াও যে ভগ্নী প্রভাবতী অহরহঃ হৃদয় মন্দিরে দে দেব মূর্ত্তির পূজা করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন, সেই দেবতা আজ দানবের মত, দানবের মতই বা কেন বলি, তাহারাও ত স্ত্রীর চরিত্রে জলাঞ্জলী দিতে ভ্রমেও কথন বলে না ! তুমি নিতান্ত পশুর মত সেই দেবী মুর্ত্তিকে স্বইচ্ছায় কলুষিত হইতে উপদেশ দিতেছ ? ধিক্ তোমার কৌলিন্যে, শতোধিক তোমার মনুষ্যত্বে, পশুরাও তোমাপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ; তাহারাও আপনার স্ত্রীপুত্রের

ভরণপোষণ করিয়া থাকে ; আর তুমি মানুষ হইয়া ঐ পাপ কথা উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন না ? বুঝিলাম আপনি নরাকারে পশু ; বল্লালসেনের কৌলিন্য মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাতে তিলমাত্র বজায় নাই, কেবল কুলীন হইয়া বংশগত মর্য্যাদার দোহাই দিয়া শুকরের মত যদৃচ্ছা ভোজন করিতেছ। অহরহঃ যে এত নেশা করে এবং অধর্ম্মে যার মতি এতাদৃশ আসক্ত, তাহাকে কি মানুষ বলা চলে ? রাজা বল্লাল যে ব্রাহ্মণকে দেবতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়াছিলেন, কুলীনের নয়টা শ্রেষ্ঠ গুণ দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন—হায়। আজ তোমাকে সেই কৌলিন্য মর্য্যাদাসম্পন্ন মনে করিয়া কন্যার পিতাগণ ভ্রমে পড়িয়া স্বকীয়া কন্যাগণের কি সর্ব্বনাশ সাধনই করিতেছেন ! তোমার মত কুলীন অপেক্ষা একজন অতিদীনহীন বংশজ ব্রাহ্মণ শত গুণে শ্রেষ্ঠ, কৌলিন্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এইরূপ পবিত্র পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলে দেশ ধন্য হইবে, বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে ! অনাথবাবু ! বাড়ুয্যে মহাশয় মারা গিয়াছেন সত্য কিন্তু দেশের লোক এখনও মরে নাই, তোমার মত লক্ষ্মী-ছাড়া, হত-ভাগা, গাঁজাখোর হয় নাই ; যে অন্নাভাবে একটী বিপন্না স্ত্রীলোক মারা যাইবে বা তোমার মত গাঁজাখোরের কথায় অমূল্য স্বর্গীয় সম্পদ সতীত্ব হারাইবে ? পাষণ্ড, তুমি কি জান না, সতী স্ত্রী প্রাণের মায়া করে না, অন্নবস্ত্রের অভাব হয়, সে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, তথাপি পাপ কাজে রত হইবে না ? তবে তুমি জীবিত আছ, ইহা তোমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাই একবার বলিতে আসিয়াছিলাম। আজ জানিলাম—পবিত্র সাধু সংযমী কুলীন আর নাই, কতকগুলি

নিরেট পশু সেই বংশমর্য্যাদার দোহাই দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইতেছে। হিন্দুগণ কেবল ধর্ম্মহানির ভীতি-মোহ সমাচ্ছন্ন হইয়া ইহাদের করে আদরের কন্যা সম্প্রদান করিয়া কুলরক্ষার পরিবর্ত্তে কুলধ্বংশ করিতেছে।

দামু ঘোষের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গিয়াছিল। কি জানি রাগ চণ্ডাল, সম্মুখে থাকিলে হয় ত তাহার বশবর্ত্তী হইয়া কি করিতে কি করিয়া ফেলিবে। তাই আর দাঁড়াইল না, দ্রুতগতিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল, যাইবার সময় বলিয়া গেল,—যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে সতীর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। দামু এই কথা বলিবার সময় চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে নাই।

৬

হিন্দু-শাস্ত্র পুত্রকে দশরাত্রি এবং কন্যাকে ত্রিরাত্রি পরে অশৌচান্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রভাবতী চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করিবেন, মৃত পিতার পিণ্ডদান করিবেন। দামুদা তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে কখন ফিরিয়া আসিবেন, স্বামীর প্রদত্ত অর্থে তিনি পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া কৃতার্থ হইবেন বলিয়া বসিয়া আছেন, আশা কুহকিনী কুহকমন্ত্রে তাঁহাকে কতই সম্মোহিত করিতেছে। প্রভাবতী সুখ দুঃখে বিজড়িত হইয়া ভাবিতেছেন—দাদা এই আসে আর কি?

দামু ঘোষ অনাথনাথের বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া মনের দুঃখে বাড়ী আসিয়াছে।। আগামী কল্য কিছু টাকা চাই, প্রভাবতীকে পিতার চতুর্থীশ্রাদ্ধে সাহায্য করিতে হইবে। অনাথনাথের নিকট দুঃখ জানাইলে পত্নীর সাহার্য্যার্থ কিছু দিতে পারেন, এই ভরসায় দামু তাঁহার নিকট গিয়াছিল কিন্তু টাকা পাওয়ার পরিবর্ত্তে যে কথা শুনিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্ম্মস্থল ফাটিয়া যাইতেছে, অনাথ উচ্চ বংশোদ্ভব হইয়া যে কথা বলিয়াছে,। তাহাতে তাহার উপর সে বিষম রাগিয়া গিয়াছে। তাই টাকার চিন্তায় চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ী আসিতে তাহার অনেক রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া সেদিন আর প্রভাবতীর কাছে আসিতে পারে নাই। টাকা কোথাও পায় নাই, অথচ প্রাতঃকালেই টাকা চাই, এই জন্য দামু গোলার কতক ধান একজনকে বিক্রয় করিবে বলিয়া তাহার নিকট হইতে দশ টাকা আনিয়াছে, ইহাতেই প্রভাবতীর পিতার শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দিয়া তাহাকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। করুণাময়ের ত পুত্রাদি নাই, প্রভাই তাঁহার সব, সে শ্রাদ্ধ না করিলে তাঁহার প্রেতত্বনাশের আর উপায় কোথায় ?

অতি প্রত্যুষেই দামু ঘোষ আসিয়া করুণাময়ের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল, গৌরী বাহিরে ছিল, মাকে ডাকিল—মা, মামা আসিয়াছে।

সোণার পারিজাত স্বর্গীয় সুষমা বিস্তার করিয়া দরিদ্রের আঁধার গৃহ পূর্ণ প্রভামণ্ডিত করিয়াছে। দামু ঘোষ গৌরীর রূপ জ্যোতি, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য ভাতি দেখিয়া মনে মনে বলিল—হতভাগা অনাথের কি দুর্ভাগ্য, এমন সোণার প্রতিমার মুখে পিতৃ-সম্বোধন শুনিয়া জীবন

সার্থক করিল না; তাহাকে কোলে পিঠে মানুষ করিয়া সৎপাত্রে সম্প্রদান করত শাস্ত্র সঙ্গত গৌরীদানের ফল লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিল না? অদৃষ্টে না থাকিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যে মানুষের সাধ্য নয়, অনাথের ভাগ্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ!

প্রভাবতী গৃহের মধ্যে কাজে ব্যস্ত ছিল, কন্যার মুখে দাদা আসিয়াছে শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বিষাদ বিমিশ্রিত কাতর স্বরে বলিলেন দাদা! কাল যে এলে না, সন্ধান কর্ত্তে যাও নাই বুঝি?

দামু চির দুঃখিতা, স্বামী উপেক্ষিতা প্রভাবতীর নিকট প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া বলিল—হাঁ, গিয়াছিলাম, সে জন্য তোমার চিন্তা কি? শ্রাদ্ধের কাল বহির্ভূত না হয়, তুমি প্রস্তুত হও, আমি দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতেছি। দ্বাদশটী ব্রাহ্মণও খাওয়ান হইবে, তুমি ও বাড়ীর ঠান্‌দিকে ডাকিয়া তাহারও বন্দোবস্ত কর। এই বলিয়া দামুঘোষ পুরোহিতের বাড়ী সংবাদ দিয়া বাজারে গমন করিল।

এত কষ্টের মধ্যেও প্রভাবতীর হৃদয় সাহস বদ্ধ, মন পুলকপূর্ণিত হইল, তাহার স্বামী যে এত স্ত্রীর স্বামী হইয়াও তাহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কুলীন পত্নীর যে কিরূপ আনন্দ তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! যাহার সহিত কেবল লইবার সম্বন্ধ, তিনি যে দিতে পারিয়াছেন; ইহার তুল্য আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? আহা পুণ্যময়, দয়াময় স্বামীর হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, না হইবে কেন, আমার প্রতি তাঁহার করুণা নাই থাকুক, সোণার গুঁড়োটী হয়েছে, অপত্য স্নেহ কোথায়,

যাইবে, এ যে পশু পক্ষীর আছে, তা তিনি ত মানব শ্রেষ্ঠ! প্রাণের সাহস ও আনন্দে প্রভাবতীর চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

অনাথের ভালবাসা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অঙ্গ পুলক স্পন্দনে স্পন্দিত হইল, শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তিনি আবেগ-আবেশে ঠানদিকে ডাকিতে রায়েদের বাটী গমন করিলেন, বালিকা গৌরী অঙ্গনে খেলা করিতে লাগিল।

হিন্দু বালিকার সব খেলাই তাহাদের গৃহিণী-পণা শিখিবার প্রথম সোপান। মা বোনের কাছে দেখিয়া শুনিয়া এই খেলাঘরের মধ্যে তাহারা যাহা শিক্ষা করে, অপর জাতিয়া স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিয়া, নানা উপদেশ পাইয়াও তাহার শতাংশের এক অংশও শিখিতে পারে না। গৌরী মায়ের কাছে দেখিয়া শুনিয়া তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত এই খেলা-ঘরেই যেরূপ খেলা খেলে, ধর্ম্মকর্ম্মে মজিয়া যেরূপ ভাবে আদর্শ সংসার পাতিবার ভাব দেখায়, তাহা দেখিলে বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির আভাস ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

হিন্দুকুল-ললনা প্রভাবতী বাটীর বাহির হন না, তাঁহার এই ছোট সংসারটীর মধ্যে খুটী নাটী লইয়া সমস্ত দিন কাটান! সংসারের কাজ শেষ করিয়া অবসর সময়ে তিনি সুতা কাটেন, চরকা চালান, পৈতা তুলেন, আর একটী বিশেষ কাজ তিনি ভাল বুঝিতেন, পিতার দেখিয়া শুনিয়া ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়া ছিলেন। এ কাজে তিনি সময়ে সময়ে পিতার ভুল ভ্রান্তিও ধরিয়া দিতেন, করুণাময় এই বৃদ্ধ বয়সে প্রসূতি প্রসব করাইয়া যখন মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ ঔষধ

নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন না. তখন প্রভাবতী তাঁহাকে উহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। করুণাময় কন্যার মেধাশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন। কিন্তু প্রভাবতী প্রগলভা ছিলেন না, কেহ জানিত না যে তিনি এ কার্য্যে পারদর্শিনী। বাটী ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতেন না, যখনই প্রাণটা বড় হু হু করিত, বিষাদ অবসাদে ভরিয়া উঠিত তখনই প্রাণের গৌরীকে লইয়া সংসারের নানা কাজের উপদেশ দিতেন। ক্ষুদ্র বালিকা বুঝিতে না পারিলে যখন হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেন, তখন কোমল প্রাণে পাথরের দাগের মত গৌরী সে কাজ আর কখনও ভুলিত না।

যখন কন্যার সহিত খেলা ধূলায় বিব্রত থাকিয়া ও প্রাণের শান্তি হইত না, মন বিষাদ ভারে একান্তই ভারি হইয়া পড়িত, তখন আস্তে আস্তে একবার তাহার পিতার পরম হিতৈষিনী রায় গিন্নীর কাছে যাইতেন; ইহা ছাড়া প্রভাবতী গ্রামের ঝিউড়ী হইলেও কাহার বাড়ী যাইতেন না।

দামুদাদার কথা শুনিয়া প্রভাবতী এইবার রায়গিন্নীর কাছে গিয়া সমস্ত বলিল, বর্ষীয়সি রায়গিন্নী এ কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। দশজনকে খাইতে,কাজকর্ম্মে আহারীয় প্রস্তুত করিতে, কুসুমপুরে তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। পাঁচজন লোক খাওয়াইব কিন্তু দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কোন লোক নাই, শুনিলে সকল কাজ ফেলিয়া তিনি দৌড়িয়া আসিতেন এবং প্রাণপণে তাহার কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিতেন। ইনি একাকিনী বড় বড় যজ্ঞ কার্য্য স্বহস্তে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিয়া কত লোকের কত উপকার করিয়াছেন।

সমস্তদিন অনাহারে আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে মা অন্নপূর্ণার নিকট প্রার্থনা করিতেন—মা! যজ্ঞ যেন পূর্ণ হয়, লোকজন যেন আহার করিয়া তৃপ্তি বোধ করে। সকল কার্য্যেই পুণ্য-বতীর এ পুণ্যময় প্রার্থনা মা অন্নপূর্ণা পূর্ণ করিতেন। পাঁচ ছয় শত লোকের আহারীয় দ্রব্য তিনি একাই সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। বৃদ্ধার দেহে এমন বল, প্রাণে এমন ধর্ম্মভাব, হৃদয়ে এমন ভক্তির প্রাবল্য ছিল। কার্য্যান্তে তিনি প্রাণধারণের মত কিছু আহার করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাটী গমন করিতেন, বিনিময়ে একটী তৃণও গ্রহণ করিতেন না। এই পুণ্যবতী বৃদ্ধার পরোপকারের তুলনা জগতে দুর্লভ!

প্রভাবতী রায়গৃহিণীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সাক্ষাৎ দরিদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি, দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিতা, প্রভাবতীকে দেখিয়া রায়-গৃহিণী শশব্যস্তে আসিয়া বলিলেন—প্রভাদিদি, কেন বোন্, কিছু দরকার আছে কি? তারপর ছলছল নেত্রে বলিলেন—আজ কি তবে করুণার জন্য কিছু কর্ব্বি, তাই আমাকে ডাক্‌তে এসেছিস্?

প্রভাবতী ক্রন্দন জড়িত ধরা গলায় বলিল—ঠান্‌দি, কেঁদেও ত বাবার প্রেতের কাজ কর্ত্তে হবে, আজ যে চার দিন হলো! ঠান্‌দি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন-তাঁর যখন ছেলে নেই, তখন তুই কেঁদে-কেটে যা কোর্ব্বি, তাতেই তার অক্ষয় স্বর্গ হবে? আহা! করুণা আমাদের চেয়ে কত ছোট, তাকে কোলে করে মানুষ করেছি, সে আগেই চলে গেল, এ রকম আর কত দেখবো, পোড়া আমার কি আর মরণ আছে দিদি? বাস্তবিক রায়-গৃহিণী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের

জন্য শোকদুঃখে অধীরা হইলেন ; প্রভাবতীও কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল তারপর দুইজনে শোক সম্বরণ করিলে, ঠান্‌দি বলিলেন—হাঁরে প্রভা ! নাৎজামাই কি কিছু পাঠিয়েছে ? প্রভাবতী আস্তে ব্যস্তে বলিল—হাঁ ঠান্‌দি ! দামুদা, কাল দেবীপুরের হাটে গিয়াছিল, সেইখানেই নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এই কথা শুনে তিনি দামুদার কাছে নিশ্চয়ই কিছু দিয়েছেন। দামুদা সকালে এসে, তোমাকে খবর দিতে বলে বাজারে গিয়েছে : অমনি পুরুৎমশাইয়ের বাড়ী হয়ে আস্‌বে।

ঠান্‌দি ! কতটী লোক খাবে, বোধ হয় দশবারটী ?

প্রভাবতী। তা না ত কি ঠান্‌দি, আর আমি কোথা কি পাবো ?

ঠান্‌দি। তোর এইবারটী দু'শো লোকের সমান—প্রভা, তার জন্য তুই কিছু মনে করিস্‌ নি। আচ্ছা তুই চ, আমি যাচ্ছি।

প্রভাবতী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে রায়-গৃহিণী বাঁড়ুয্যের-বাটী গিয়া গৌরীকে লইয়া বারটী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন ! ইতিমধ্যে দামু ঘোষ দ্রব্যাদি কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। ঠান্‌দি, নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া রন্ধনাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং দামু ঘোষকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—দামু আমাদের আগুরীর ছেলে বটে, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে খুব মতি আছে। আহা, করুণার কাছে ছেলে-বেলায় উপকার পেয়েছে বলে সে এখন কি না ক'র্‌ছে, নেম্‌কহারামী একটুও করে নি ? একেইত বলে ভদ্রলোকের ছেলে—আহা, বেঁচে থাক, ওর বাড়বাড়োন্ত হোক্‌ ?

দামু বাহিরে পরিশ্রম-ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তামাক সাজিতে ছিল, ঠান্‌দির আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বলিল—ঠান্‌দি, আমরা কি করি, তুমি যা

কর, তার তুলনা নাই—পরোপকার উহাকেই বলে, আমি ঠাকুরের কাছে উপকৃত তাই, আর ক'র্‌ছিই বা কি ? কিন্তু তুমি পাড়ায় যা করো ঠান্‌দি—এমন কি কেউ পারে ? তোমায় নিঃস্বার্থ ভাব, আর আমাদের স্বার্থজড়িত ভাব—তফাৎ যে অনেক ?

ঠান্‌দি দামু ঘোষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নিজের কাজে ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রভাবতী সংযতচিত্তে পুরোহিত মহাশয়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, আর গৌরী পাড়ার ঠান্‌দিদি ভবতারিণীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া আপন মনে গাঁথিয়া লইতেছে ! এমন সময় দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তটস্থ হইল, ভক্তি-প্রণত চিত্তে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিল। করুণাময়ের অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন—তাই আজ দেবানন্দ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন।

দেবানন্দ একজন যাপক ব্রাহ্মণ, সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাকর্ম্মী, তিনি সংসারে আবদ্ধ না হইলেও সময়ে সময়ে যজমান বাটী আসিয়া উপস্থিত হইতেন, ত্যাগ যে কাহাকে বলে—তিনি তাহা সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার আকাজ্ক্ষা নাই : কেবল সমস্ত দিন পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়া রাত্রি কালে আপন কাজ—সাধন-ভজনে মত্ত থাকেন। এরূপ পুরোহিত বা গুরু বহু ভাগ্য না হইলে পাওয়া যায় না। তাঁহার যজমান অনেক, শিষ্য ও অসংখ্য, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক সময়ে পাওয়া অসম্ভব—কখন্ কোথায় থাকেন, তাহার স্থিরতা নাই। লোভ কাহাকে বলে তিনি জানেন না, অথচ লব্ধবস্তু যতই সামান্য হউক না কেন, তিনি মায়ের দান বলিয়া মাথায় তুলিয়া লন। এ হেন পুণ্যাত্মা দেবানন্দ করুণাময়ের গুরু এবং পুরোহিত—রূপে তাহাকে ধন্য

করিয়াছিলেন। করুণাময়ের প্রাণে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সমস্ত সমাধান করিয়া দিতেন বলিয়া করুণাময় আজীবন ঠিক পাকা হিন্দুর মত কাটাইয়া গিয়াছেন।

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধ বাসরে অদৃষ্টক্রমে দেবানন্দের দর্শন পাইয়া প্রভাবতী প্রফুল্ল অথচ শোকবিহ্বল চিত্তে পিতার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল। দেবানন্দ করুণাময়কে বড় ভালবাসিতেন—প্রভাবতীকে আপনার পৌত্রীর মত যত্ন করিতেন। করুণাময়ের জীবদ্দশায় যখন তিনি গ্রামে থাকিতেন—প্রায়ই করুণাকে করুণা করিয়া প্রত্যহ তাঁহার পারত্রিক উন্নতির বিষয় উপদেশ দিতেন।

প্রভাবতী কুলীনের হাতে পড়িয়া কখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করে নাই, কাজেই দেবানন্দ তাহার সমস্ত বিষয় জানিতেন, তাহার ভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাকে সময়ে সময়ে সাহস দিতেন। আজ পিতৃ-বিয়োগে প্রভাবতী তাঁহার নিকট হাপুস নয়নে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। দেবানন্দ বলিলেন—প্রভা আর কাঁদিয়া কি করিবি দিদি, মানুষের ভবে আসা কেবল যাবারই জন্য, সকলেরই এই পথ, তবে কিছু দিন আগে আর পাছে! করুণার যেমন ছেলে নাই—তেমন তুই আছিস্—তার পারলৌকিক কাজ করে মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দে!

প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দাদা মশাই! আপনিই ত সব, আপনিই ত তাঁর ইষ্টদেব, এক্ষণে যাহাতে বাবার আমার সদ্গতি হয়, তা করুন, এ সময় আপনি যখন দেশে এসেছেন, তখন আমাদের এবং তাঁহার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে?

দেবানন্দের ক্রিয়াকলাপ করাইবার পদ্ধতি অতি বিশুদ্ধ। তিনি নিজে

একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মী—তাই কিরূপে কর্ম্ম করিলে জীবের শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তাহা তিনি ভালরূপ অবগত ছিলেন। প্রভাবতী দ্বারা তিনি করুণাময়ের পারলৌকিক কার্য্য বিশুদ্ধ ভাবে, সনাতন শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন করিলেন। এবং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণান্ত সমাধা করত যৎসামান্য আহার করিয়া গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময় প্রভাবতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"প্রভা! তুমি ধার্ম্মিক পিতার পুত্রী, তোমায় বেশী কিছু বলিবার নাই; কষ্টে বিচলিত হইও না, ধর্ম্মপথে থাকিও, তাহা হইলে জীবনে কখন দিশেহারা হইবে না। তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে—গৌরী তোমার রাজরাণী হইবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপুরুষের এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে মায়ে ঝিয়ে পুলকপূর্ণ প্রাণে তাঁহার পদধূলি লইল।

৭

গুরু পুরোহিত হিন্দুর ঘরের পূজনীয় দেবতা। গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করা, বিপদাপদের শান্তি করাই তাঁহাদের কার্য্য—এখন অভাব হইলেও পূর্ব্বে এইরূপ গৃহদেবতা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়াই হিন্দুর সংসারে সুখ ছিল, শান্তি ছিল, সংসার মহাপুণ্যের আগার ছিল। তাই এখানে যথার্থ মানুষ তৈয়ারী হইত।

পূর্ব্বে গুরু পুরোহিত শিষ্যের নিকট কেবল শোষণ করিবারই ব্যবস্থা করিতেন না, পিতার মত তাহাদের অভাব-অভিযোগেও মাথা দিতেন, কিসে তাহা পূরণ হইবে, সে বিষয় অহরহঃ চিন্তা করিতেন, অবস্থা-নুকূল হইলে তাঁহাকে অভাবমুক্ত করিতেও ক্রটী করিতেন না।

করুণাময় মারা গিয়াছে—তাহার সম্পত্তিও কিছু নাই, তবে প্রভাবতী ও গৌরীর চলিবে কেমন করিয়া ? দামু ঘোষ করুণার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ও কৃতজ্ঞ শিষ্য কিন্তু সেওত তাদৃশ ধনবান নহে, তবে দুইটী হিন্দু ললনার উপায় কি হইবে ? শুনিয়াছি প্রভাবতীর স্বামী তাহাদের কোনও সংবাদ গ্রহণ করে না। বিবাহের সময় দেবানন্দ ছিলেন না, তাহা হইলে তিনি কৌলিন্যের জন্য শিষ্যকে কথনই এমন অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে দিতেন না কিন্তু এখন ত আর উপায় নাই ! এতো আর অন্য জাতি নয় যে পত্যন্তর গ্রহণ করিবে ?

দেবানন্দ একদিন দামু ঘোষকে ডাকিয়া সমস্ত শুনিলেন। করুণা-ময়ের মৃত্যুর পর হইতে সে যে এই দুইটী জীবকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেছে শুনিয়া তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দামু ঘোষ বলিল—দাদাঠাকুর ! আমার অবস্থাত জানেন—তবে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই ; নিজের জন্য না ভাবিয়া আমার যা কিছু উপার্জ্জন সমস্তই উহাদের জন্য খরচ করি। ইহাতে কত লোকে আমাকে কত কথা বলে। কিন্তু উহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য উহারা না খাইয়া মারা যায়—সে জন্য কেহ একদিনও ভাবে না ; একদিনের জন্য কেহ সাহায্য করিতেও আসে না। গুরু-দেবের কন্যা বলিয়া আমি

ঠিক ভগ্নীর মত তাহাদের দেখি শুনি বলিয়া পাড়ার লোকে কত কথা কয়; সময়ে সময়ে বিপরীত ভাবে কলঙ্ক ঘোষণা করিতেও ছাড়ে না। তবে উপরে একজন সর্ব্বদর্শী আছেন—তিনি পরম বিচারী; লোকের কথায় যায় আসে কি? এই জন্য আমি কিছুই ভয় করি না। তবে কি জানেন প্রভূ! প্রভার মেয়েটা বড় হয়ে উঠলো, তার উপায় কি করা যায়?

দেবানন্দ দামুকে খুব বাল্যকাল হইতে জানিতেন—উগ্রক্ষত্রিয় দামু ঘোষ চিরদিনই স্পষ্টবক্তা, সরল প্রকৃতি, পরের উপকারে সর্ব্বস্ব দান করে, এই জন্য সে অল্পবয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর আর বিবাহ করে নাই; চরিত্রও খুব নির্ম্মল; তাহাকে দেখিলে—তাহার আচার ব্যবহার এবং বদনের প্রফুল্লতা দেখিলে তাহাকে কিছুতেই পাপী বলা যাইতে পারে না—পাপীর বদন অত প্রসন্ন, অত হাসিখুসী মাথা হয় না, তার মনের বল অত প্রবল হইতেই পারে না। ঠাকুর বলিলেন—দামু! তুমি লোকের কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবেহেলা করো না। আজ কাল্‌কার মানুষ ভাল করিতে পারে না—অথচ কেহ করিতে গেলে তাহাতে বাধা দেয়, এইজন্য এজাতির এত অধঃপতন হইতেছে; তুমি ধর্ম্মভাবে কার্য্য কর—ভগবানের নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবে। আচ্ছা! প্রভার স্বামীর কোন সংবাদ রাখিয়াছ কি? সে কি স্ত্রী পুত্রের এ দুঃসময়ে কিছু সাহায্য করিবে না?

দামু ঘোষ দুঃখিত স্বরে বলিলেন—ঠাকুর! সে হতভাগাটার কথা আর বলিবেন না; বাঁড়ুজ্যে মহাশয় মারা যাইবার পর আমি একদিন তার সহিত দেখা করেছিলাম। সাহায্যের কথা বলেছিলাম—

তাহাতে পাষণ্ড বলিল—আমরা কুলীন, কত স্ত্রী আমাদের আছে ; তাহার যদি একটা মারা যায় বা অন্নাভাবে ব্যভিচারিণী হয় তাহাতে আমাদের কিছু যায়—আসে না। স্ত্রী পতিতা হইয়াও আমাদের টাকা দিলে আমরা তাহার পাতিত্য দূর করিয়া দিতে পারি ! আমি সেই কুলপাংশুল কুলীন পুত্রের কথা শুনিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া চলিয়া আসিয়াছি ! শ্রাদ্ধের জন্য কিছু চাহিতে গিয়াছিলাম —কিন্তু তাহার মুখে ঐ কথা শুনিয়া—আর টাকা চাহিতে প্রবৃত্তি হইল না—গোপনে নিজের ধান্য বিক্রয় করিয়া—দশবার টাকা সংগ্রহ করত প্রভার অশৌচান্ত করিয়াছি।

সাধু ! সাধু ! দামু, তুমিই যথার্থ পরের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছ, মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন। তাহার নিকট আর যাইবার আবশ্যক নাই। করুণাময়ের জমীজমা বিক্রয় করিয়া যদি ঋণ পরিশোধ করিতে হয় সেও ভাল, তথাপি সে পাষণ্ডের আর মুখদর্শন করিও না।

দামু। তাতো করিলাম—কিন্তু প্রভা যে সেই স্বামীর জন্যই প্রাণপাত করে ; তাহাকে দেবতারও অধিক বলিয়া ভাবে, ঘৃণাক্ষরে তাহার নিন্দাবাদ কাণে শুনিতে চায় না।

দেবানন্দ।—দামু ! উহাইত হিন্দু স্ত্রীর বিশেষত্ব, এমনটী আর কোন জাতীয় স্ত্রী লোকে পাইবে না। আপনা ভুলিয়া স্বামী-সাগরে ডুবিয়া যাইতে কেবল হিন্দু স্ত্রীই পারিয়াছে। স্বামীর সর্ব্বব দোষকে গুণ বলিয়া ধরিয়া লইতে, নরকের কীটকে দেবতা বলিয়া মানিতে,হিন্দু স্ত্রীই পারে। সভ্যসমাজ ইহাকে মুর্খতা, জ্ঞানহীনতা বলিলেও নিঃস্বার্থ প্রণয়ের নিকট আপনার সুখসৌভাগ্য হীনতার চিন্তা স্থান পাইতে পারে না, প্রভাবতী

যাহা করে তাহা সতী-স্ত্রীরই আদর্শ। তাহা সে করুক ; তুমি যাহা করিতেছ—তাহা কর ! আবশ্যক হইলে আমার কন্যাও জামতার নিকট কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিও, আমি তাহাদিগকে বলিয়া যাইব, তাহারা তোমার কার্য্য দেখিয়া খুব সুখ্যাতি করিয়া থাকে ?

দামু। প্রভু ইহাতে সুখ্যাতি অখ্যাতির কিছুই নাই ; আমি এমন কোন মহৎ কাজ করিতেছি না—যাহার জন্য সকলে আমাকে প্রশংসা করিবে, আর সুখ্যাতি অখ্যাতি আশা করিয়াও আমি কিছু করি না। মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা না করিলে পশুর মত হইতে হয়, আমি তাহা করিবই করিব ; মানুষের মত হাত পা লইয়া, জ্ঞান বুদ্ধি লইয়া,পশুর মত কাজ করিলে ভগবানের সৃষ্টি মধ্যে আর তাহার পার্থক্য রহিল কই ?

দামু ঘোষ জাতিতে কিছু হীন হইলেও তাহার হৃদয়ভাব, তাহার সতেজ প্রাণের তেজস্বী কথাগুলি শুনিয়া তাহাকে আধুনিক অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বড় ভাবিয়া দেবানন্দ বলিলেন—দামু ? আশীর্ব্বাদ করি—তুমি দীর্ঘজীবী হও ?

দামু। আপনার মত মহাপুরুষের অকাট্য আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য —তবে শুধু বাঁচিবার আশীর্ব্বাদ না করিয়া—কর্ম্ম করিবার শক্তি লাভের আশীর্ব্বাদ করুন ; যেন লোকের ভালমন্দ কথায় কর্ত্তব্য-পথ ভ্রষ্ট না হই !

দেবানন্দ। বাবা ! যার প্রাণ গড়ে উঠেছে, তাহাকে সহজে কেহ ফেল্‌তে পারে না। ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া কর্ত্তব্য-পথে ধাবিত হও— পথ আপনাপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে—ধর্ম্ম কর্ম্মের সহায় ভগবান !

দামু। প্রভু ! আপনাদের সময়ে এই কুসুমপুর গ্রাম যেমন পবিত্র ছিল, এখন তেমনি অপবিত্র হয়ে উঠেছে ; এখান থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম

রক্ষা বড়ই দুঃসাধ্য। আমি প্রভাবতীও তার কন্যাটীকে নিয়ে বড়ই বিব্রতে পড়েছি, নতুবা এ গ্রাম ত্যাগ করে আমি আপনার পাছু লইতাম, আমার আর কে আছে ঠাকুর! যে দেশের প্রতি এত মায়া কর্ব্বো?

দেবানন্দ! বৎস! যার হৃদয় আছে, পরকে যে আপনার কর্ত্তে শিখেছে, কেহ না থাক্‌লেও তার সবই আছে; এই জগৎশুদ্ধ লোককেই যখন সে ভালবাসে, তখন তার আপনার লোকের অভাব কি?

দামু। ঠাকুর। এখন গৌরী ক্রমশঃ বড় হচ্ছে, আর ত তাকে বেশী দিন রাখা যাবে না; এখন তার একটা উপায় বলে দিন।

দেবানন্দ। দামু! উপায় ভগবান, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র; তাঁর পদে মতি রেখে কাজ কর—সকল দিক সোজা হয়ে যাবে। শুনেছি প্রভাবতীকে কুলীনে করবার জন্য করুণা তাকে একটা অপাত্রে সম্প্রদান করেছে, অমন সোণার প্রতিমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে! কিন্তু তুমি যখন তাহাদের ভার নিয়েছ, তখন যেন গৌরীকে যার তার হাতে সঁপে দিওনা, মেয়েটাকে চিরকালের জন্য অসুখী ক'রে তার জীবনটাকে যেন ব্যর্থ করে দিও না?

দামু। ঠাকুর! ঐ ভাবনাইত মহা ভাবনা, অর্থ নাই অথচ সকল দিক বজায় রেখে কাজ করা কেমন করে চল্‌বে?

দেবানন্দ। দেখ, তুমি শিক্ষিত পুণ্যবান পাত্রে গৌরী দান করিও, এতে যদি সে কুলীন না হয়ে মৌলিক হয়, সেও ভাল। টাকার লোভে গৌরীকে চরিত্রহীন বড় লোকে দিও না, বরং দিন আনে দিন খায় এমন দরিদ্র, শিক্ষিত, চরিত্রবান পাত্রে তাহাকে সম্প্রদান

করিও, তাহা হইলে মেয়েটা আর কিছু না হউক, আজীবন স্বামীর সুখে সুখিনী হইয়া তার মার মত জীবনটা ভারবহ মনে কর্ব্বে না। দামু! স্ত্রী লোকের স্বামীর সুখই সুখ, সে একবেলা শাকান্ন খেয়ে স্বামীর সুখে কুটীর বাসী হইতে রাজী হয়, তথাপি বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ীর সহিত অট্টালিকাবাসী হয়েও সুখবোধ করে না। প্রভাবতীর অবস্থা দেখিয়া যেন তোমার সকল ভ্রম ঘুচে যায়!

দামু। ঠাকুর! আমারও তাই ইচ্ছা; শুধু কুলীন লইয়া ত আর ধুইয়া খাইব না; মেয়ে যদি খেতে পরতে না পেলে, মনের সুখে এক-দিনও স্বামীর ঘর কর্ত্তে না পেলে, ত কেবল কুলে কি হবে, কিন্তু এখানে ত তেমন পাত্র নাই!

দেবানন্দ। অন্যত্র দেখ। এ গ্রামে বিবাহ দিবার সুবিধা হবে না, আমি প্রভাবতীকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া দিয়াছি। সে পিতার মত ধাত্রী চিকিৎসা করুক; এমন কয়েকটী মুষ্টিযোগ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি, যাহাতে সে সহজেই প্রসূতি প্রসব করাইয়া যশোলাভ করিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমও হইবে। তবে এ গ্রামে আর থাকিয়া কাজ নাই, করুণার জমীজমা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করতঃ কলিকাতায় গমন কর, সেখানকার লোক হিংসা-পরায়ণ নহে, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র কলিকাতায় অনেক মহামান্য লোকের বাস— সেখানে লোকের সহানুভূতি পাইবে, আর ভগবান যখন তোমার সহায়, তুমি যখন শিক্ষিত ন্যায়বান যুবক, তখন কোন দিকেই বাধা পাইবে না, কলিকাতায় যাইলে তুমি সহজেই একটী চাকরী বা ব্যবসা করিয়া

নিজের দিনত চালাইতে পারিবেই, অধিকন্তু ইহাদের সাহায্য করিতেও অপারগ হইবে না।

দামু। প্রভূ! আমিও তাই মনে করেছি, শুনেছি কলিকাতায় কাশীপুরে প্রভার এক বিধবা বৃদ্ধা মাসী আছেন, এ সকল বিক্রয় করিয়া সে সেই স্থানে যাইবে, আমিও ইহাদের সহগামী হইব। প্রভাকে কোলে করিয়া মানুষ করেছি, এ অবস্থায় তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দিতেও আমার ভাবনা হয়। যদিও প্রভা আদর্শ নারী-রত্ন, তথাপি এখনও পাঁচ সাত বৎসর তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতে হইবে, তারপর গৌরীর বিবাহ হইলে, সে ঘরণী গৃহিণী হইলে, প্রভার বন্দোবস্ত করিয়া আমি দেশ ভ্রমণে যাইব। আর যদি হতভাগা অনাথ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া পড়ে, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

দামু ঘোষের হৃদয়ের অন্তঃস্তলে অনেক অপার্থিব ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে, দেবানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করত বলিলেন—দামু! তোমার মত ধর্ম্মপ্রাণ যুবক দেশে যত অধিক পরিমাণে জন্মাইবে দেশমাতৃকার অধীনতা শৃঙ্খল ততই সত্বর অপনোদিত হইবে। তুমি উগ্রক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছ; যে তোমাকে বুঝিতে পারিবে সে তোমার সাধু সহবাস সুখে বঞ্চিত হইবে না। মা ভগবতী তোমার আশা পূর্ণ করুন, হৃদয়ে শক্তিদান করুন। তুমি নির্ভয় হৃদয়ে দেশের মঙ্গল কার্য্যে প্রাণপণ কর, মায়ের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে বর্ষিত হইবে। দেবানন্দ সেই দিন দেশ ত্যাগ করিলেন—দামু পদধূলি লইল।

৮

প্রভাবতী শ্বশুর ঘর কখন দেখে না। পিতৃগৃহই তাহার সর্ব্বস্ব—পিতাই তাহার সর্ব্বস্বময় দেবতা—তাই পিতৃবিয়োগের বৎসর তাহার বড়ই দুঃখে কাটিতে লাগিল। দৈহিক পীড়া, মানসিক অশান্তিরও ইয়ত্তা রহিল না; তাহার উপর উত্তমর্ণগণ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পাড়ার কয়েক ঘর সদ্বংশ ব্যতীত কি জানি কেন, প্রভাবতীর অনিষ্ট চিন্তায় সকলেই ফাঁদ পাতিল। মানুষ দুর্ব্বল হইলেই সবলে তাহাকে চাপিয়া ধরে—ইহাই কলির নিয়ম; বিশেষতঃ দুর্ব্বল অবলা স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচার ত একালের একপ্রকার রীতি নীতি—কাজেই কষ্টের একশেষ, তবে দুর্ব্বলের—সম্বল, ধার্ম্মিকের—বন্ধু, বিপন্নের সহায় দামু ঘোষ যখন পর্ব্বতের মত তাহাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তখন তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করে এমন সাধ্য কার? কিন্তু দামুর ত টাকা নাই—সে ঋণ পরিশোধ করিবে কিসে? তাহার উপর গৌরী দিন দিন বিবাহ যোগ্য হইতেছে—বিষম ভাবনার কথা!

প্রভাবতী একদিন দামুকে ডাকিয়া বলিলেন—দামুদা! আমাদের এখন তুমিই একমাত্র বল-বুদ্ধি-ভরসা, গ্রামে এমন চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া চল বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া বাবাকে ঋণমুক্ত করতঃ স্থানান্তরে যাই। শুধু এখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? গৌরী ক্রমশঃ বড় হচ্ছে তা দেখছত?

দাদু। হাঁ দিদি! তাত দেখছি, একটা উপায়ের চেষ্টাত করতেই

হয়েছে, আর বসে ভাবলে চল্‌বে না, তুমি আমাকেই বল-বুদ্ধি-ভরসা মনে করো না, আমি কে, জগতের কোন্ কীটানুকীট? বল-বুদ্ধি—ভরসা ভগবান, তবে আমি তাঁরই আদিষ্ট চাকরের মত তোমাদের সঙ্গে সাথে থেকে, তিনি যেমন চালাচ্ছেন, আমি তেমনি চল্‌ছি?

প্রভা। দামুদা! তুমিই যতই বল, এ সময় তুমি না থাক্‌লে আমাদের অবস্থার ব্যবস্থা থাক্‌তো না?

দামু। সে তোমার ভুল কথা, যে দেশে দামু নাই, সে দেশে কি গরীব লোক বাচে না? ভগবান সকলের মূলাধার। যাহা হউক, টাকার জন্য ত নন্দী মশাই বড়ই বিরক্ত করছে; বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে দুই একটা ছোট বড় কথাও বল্‌ছে। তিনি পরলোকগত হয়েছেন, এখন তাঁর দেনার জন্য ছোট লোকের কথা শুনা ভাল নয়, তুমি যা মনে করেছো তাই করি; এ সমস্ত বিষয় বেচিয়া তাঁর দেনা শোধ করে দিই, আর আমার জমি জমা বিক্রয়, করে যা হয় তাই নিয়ে চল যাই কিন্তু যাব কোথায়?

প্রভা। দামুদা! কল্‌কাতায় কাশীপুরে আমার এক বৃদ্ধা মাসীমা আছেন, তা বোধ হয় জানো তাঁর কেউ নাই—তাঁর কাছে গেলে—থাকবার কষ্ট হবে না তবে থাওয়া পরাটা চালান চাই, তাঁর ত টাকা কড়ি বা স্বামী-পুত্র নাই?

দামু। কলকাতায় গেলে আমাদের খাওয়া পরার ভাবনা হবে না, সেখানে অনেক রকমে উপায় হতে পারবে? কারণ সে রাজধানী আর হাতেও ত আমার কিছু টাকা কড়ি থাক্‌বে? ছোট খাট একটা কারবার করলেও চলে যাবে?

প্রভা। আচ্ছা দাদা, আর এক কথা, এই সময় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে, এইরূপ দুঃখ জানিয়ে আগেকার মত কিছু কি আদায় হয় না; গৌরীর বিয়ের কথাও কি জানান যায় না; একবার না হয় তাঁকে আস্‌তেই বলে দেখনা, কি বলেন?

প্রভাবতীর বিশ্বাস পিতৃশ্রাদ্ধে যে টাকা খরচ হইয়াছে, তাহা তাহার স্বামী প্রদত্ত। দামু ঘোষ যে গোলার ধান বিক্রয় করিয়া টাকা দিয়াছে—তাহা প্রভা জানে না। আর প্রভাবতীর প্রাণে কোন প্রকার আঘাত লাগিবে বলিয়া সে তাহা প্রকাশও করে নাই, কারণ স্বামীর তাচ্ছিল্য সতীর পক্ষে একান্ত অসহ্য, তাই দামু তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াছিল, এক্ষণে স্বামীর নিকট যাইবার অনুরোধ শুনিয়া দামু বলিল—দিদি! আমি সে মুখে আর যাইব না? তাহাকে দেখিলেও পাপ হয়, কথা শুনা ত পরের কথা!

স্বামীর প্রতি প্রভাবতীর ভক্তি বিশ্বাস অচলা ছিল—এক্ষণে দামুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রাণে বিষম আঘাত পাইয়া ম্লানমুখে বলিল—কেন দামুদা! তুমি ত তখন তাঁর খুব প্রশংসা করেছিলে, এখন আবার ওকথা বল্‌ছো কেন?

দামু একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—তখন না বলিলে, তুমি পাছে দুঃখ কর, আর কর্ত্তার শ্রাদ্ধে তোমার মনে পাছে একটা খট্‌কা লাগে তাই প্রকাশ করি নাই। অনাথ অতি পাষণ্ড তার কাছে গিয়া আমি সমস্ত কথা জানালে, দুঃখ করা বা টাকা দেওয়া ত পরের কথা—সে যে কথা বলেছিলো তা শুন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়?

প্রভাবতী। কেন দাদা! তিনি ত তেমন নন্, তবে কেন তুমি বৃথা তাঁর দোষ দিচ্ছো!

দামু। তুই তার মেজাজ কি বুঝবি দিদি! সেদিন টাকা চাইতে বল্লে কি—আমি কুলীনের ছেলে, টাকা দিবার সম্বন্ধ নাই, টাকা নেবার সম্বন্ধ; কুলীনের স্ত্রী কুলটা হয়েও স্বামীকে টাকা দিতে পারে, তাতে তার পাতিত্ব হয় না। তবে যদি কেহ পতিত হয়—আমার মত মহারথী কুলীন সেখানে পায় ধূলা দিলে তার উদ্ধার হয়ে যাবে। আমি এ কথা শুনে রাগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম, যদি সে শ্বশুর বাড়ী না থাক্‌তো তা হলে হয় ত হাতাহাতি হয়ে যেতো;—দিদি! এমন, অভদ্র, নীচ, কুলপাংশুলের কাছে, আমি আর কিছুতেই যেতে পারবো না?

স্বামীর উপর প্রভাবতীর বড় ভক্তি, বড় শ্রদ্ধা ছিল। আজ সেই স্বামীর মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কেবল গভীর দুঃখে সতীর চক্ষু ফাটিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বড় বড় অশ্রু কি রক্তপাত হইল—তাহা ভগবানই জানেন? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রভাবতী বলিলেন—দাদা! তুমি কোন কথা বলিলে না?

দামু। আর কি বলিব! উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলাম—অনাথবাবু, যদি ভগবান থাকেন—সতীর গতি মা ভগবতী যদি সতীর প্রতি চাহিয়া থাকেন—তাহা হইলে এই বাক্যের ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে একদিন না একদিন তোমাকে, এই সতীর শরণাপন্ন হয়ে জীবন ধারণ করিতে হইবে। প্রভাবতী স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এরূপ দুর্বাক্যে তাহার প্রাণের ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম না হইলেও বলিল—দাদা সাধে কি বলিয়াছিলাম, তুমিই আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা, এক্ষণে যত শীঘ্র পার এ সকল বিক্রয় করিয়া চল—আমরা স্থানান্তরে যাই, কলিকাতার সেই গুপ্ত স্থানে গিয়া শেষ কটা দিন এক

প্রকারে কাটাইয়া দিই, স্বামী—পরিত্যক্তা নারীর জীবনে ফল কি! দামুদা! অর্থই কি জগতের এত প্রার্থনীয় জিনিষ, যাহা না পাইলে স্বামী দেবতাও স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হন?

দামু। না দিদি, এ সকল কথা কেবল জাতিগত কুলীন জামাতাগণই বলিয়া থাকে, কারণ তাহারা অপদার্থ; কুলীনের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের নাই। তাহারা কেবল কুলীনের ছেলে বলে এইরূপ কথা ব'লে প্রকৃত পুরুষ কি ঐরূপ অপৌরুষেয় কথা মুখে আনিতে পারে? তুমি ভেবো না দিদি, অনাথকে এর ফল ভোগ করতেই হবে?

স্বামীর প্রতি দামু দাদার এ শাপ প্রদান প্রভাবতীর তত ভাল লাগিল না; তিনি বলিলেন—সে দিন হয়ত তাঁর মেজাজটা ভাল ছিল না! যাহা হউক দাদা! আর বিলম্ব করো না—যত শীঘ্র পার এ গ্রাম পরিত্যাগের একটা উপায় কর!

যখন দুইজনে এই সব কথা হইতেছিল, তখন রায়গিন্নী আসিয়া দর্শন দিলেন। করুণাময়ের মৃত্যুর পর দামুঘোষ, প্রভাবতী ও গৌরীর তত্ত্বাবধান করে, তাহাদের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব দান করে দেখিয়া পাড়ার কত লোকে তাহাকে কত কথা বলে, কত জল্পনা-কল্পনা করে। বলে—প্রভাবতীর এই অল্প বয়স—আর দামু ছোঁড়ারও বয়স বেশী নয়—করুণা মারা যাবার পর ওদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও ছোঁড়ার অত মাথা ব্যথা কেন—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য আছে! প্রাণের আদান-প্রদান ভিন্ন একটা আগুরীর ছোঁড়ার প্রাণ ওর জন্য এমন করে কাঁদতে পারে না। দামু আর বে-থা করে নি, প্রভা পোড়ারমুখীর স্বামীও আর ঘরে আসে না। কাজেই বয়সের স্বধর্ম্ম যাবে কোথা—

হতভাগী মেয়েটার এ কি কীর্ত্তি—শেষে কিনা একটা আগুরীর সঙ্গে জুটলো।

কুসুমপুরের লোক অধিকাংশই মূর্খ এবং পরশ্রীকাতর, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা লইয়াই কাল কাটায়—তাহারা স্বর্গীয় স্বভাব-সম্পন্ন মহামনা উগ্রক্ষত্রিয় দামুঘোষকে বুঝিবে কি? যাহারা বুঝে, তাহারা কখনও কোন সন্দেহ করে নাই, তাহাদের মধ্যে রায়বংশ একঘর, এই জন্য রায়গৃহিণী প্রতিদিন প্রভাবতীর নিকট না আসিলে—সেই দেবীমূর্ত্তি না দেখিলে থাকিতে পারেন না—তাই সুখে দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিয়া আজ মধ্যাহ্নে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন।

গৌরী প্রাঙ্গণে খেলাঘরে রান্না করিতেছিল। সইয়ের পুতুলের সহিত পুতুলের বিবাহ দিয়া আজ জামাই ঘরে আসিবে বলিয়া কত প্রকার ধূলার চচ্চরি, কাদার ডাল্‌না, কচুপাতার লুচি প্রস্তুত করিতেছিল। মা ও মামার শোকদুঃখের কথায় তার থাক্‌বার দরকার কি, সেত দু'টা বড় বড় পর্ব্বতের আড়ালে রয়েছে—ভয়-ভাবনা তার কিসের?

রায়গৃহিণীকে প্রাঙ্গণে আসিতে দেখিয়া আদরিণী গৌরী আলু থালু বেশে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া ডাকিল—মা, ওমা! ঠান্‌দি এসেছেন? রায়গিন্নী বলিলেন—আমি কি তোদের সকলেরই ঠান্‌দি, ওরে দামু, তোর বোন্‌ঝির কথা শোন্‌?

দামু তখন আহারাদির পর উঠানের আমতলায় বসিয়া তামাক টানিতে ছিল—আর প্রভাবতী শোকে-দুঃখে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন। কন্যার সাড়া পাইয়া এবং ঠান্‌দিকে আসিতে দেখিয়া আন্‌মনে চক্ষের জল মুছিয়া শশব্যস্তে বলিলেন—

ঠান্‌দি ! আসুন—আসুন—আজ খোকা সঙ্গে আসে নি যে? বলিয়া দাওয়ার উপর একখানি পীঁড়ি পাতিয়া দিলেন।

রায়গিন্নীকে গ্রামশুদ্ধ লোকেই ঐ নামে ডাকিত। পাড়া বেড়াইতে আসিবার সময় তাঁর পৌত্র প্রায়ই সঙ্গে থাকে। তাই প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—খোকা আসে নি যে?

ঠান্‌দি বলিলেন—না, সে এই বউমার কাছে ঘুমিয়ে পড়লো; তাই মনে করলাম—একবার তোদের দেখে আসি।

প্রভাবতী অতি ধীরভাবে কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিল—গ্রামে তোমরা ও চক্রবর্ত্তীরা আছ বলেই এখনও বেঁচে আছি, নইলে কতদিন আগে এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হতো।

ঠান্‌দি। না দিদি! আমরা আর তোদের এমন কি কর্‌ছি, দামু যা করছে তার তুলনা হয় না!

প্রভাবতী। ঠান্‌দি! ও ত মার পেটের ভাইয়ের মত বা তার চেয়েও বেশী, ওর কথা ছেড়ে দাও, ও না থাক্‌লে আমাদের অস্তিত্ব থাক্‌তো কি না সন্দেহ। তবে তোমরা যা কর তার ও তুলনা নাই—গ্রামে আর কেউ এমন করে না—এইবার তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে বলে প্রাণটা কয় দিন বড়ই ছট্‌ ফট্‌ কর্‌ছে।

ঠান্‌দি অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে বলিলেন—শুনেছি ভাই শুনেছি—তাই ত একবার দেখ্‌তে এলাম—সত্যি কি দেনার কোন কিনারা হলো না—জমিজমা বেচে কল্‌কাতা যাওয়াই ঠিক হলো?

দামু। আর কি হবে ঠান্‌দি—জমি বিক্রয় ভিন্ন দেনা শোধের উপায় কি, শুধু কি তাই, গৌরীর বিয়ে—এখানে পাড়ার লোক যে রকম

শত্রুতা করছে, বৃথা বদ্‌নাম রটাচ্ছে, তাতে কি আর এখান থেকে গৌরীর বিয়ে হবে—তার জন্যও এ গ্রাম ছাড়্‌তে হবে। আর পাওনা-দারগণের কড়া তাগাদার কারণও পাড়ার লোক, এ অবস্থায় কি করি বলো ঠান্‌দি।

ঠান্‌দি। তাতো বটেই, দাদা! সবই শুন্‌তে পাচ্ছি—সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তাই প্রাণ খারাপ হয়েছে বলে একবার তোদের দেখ্‌তে এলাম। লোকে ভাল কর্ত্তে পারে না, মন্দ কর্ত্তে আটে কাটে দড়, তা ভাই যাই করুক, উপরে ভগবান্ আছেন, তিনি রাত-দিনের কর্ত্তা, সব দেখ্‌ছেন, জান্‌ছেন,—আর তুমি যখন তাঁর দিকে চেয়ে কাজ করছো, তখন তোমাদের মন্দ কেউ কর্ত্তে পার্‌বে না, ভগবান্ একটা কিনারা করবেনই?

প্রভা। তাই আশীর্ব্বাদ কর ঠান্‌দি, যেন দেনাগুলি শোধ ক'রে বাবাকে অঋণী কর্ত্তে পারি, আর গৌরীকে একটা ভাল পাত্রে দিতে পারি, তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—তিনি ত আর দেখ্‌লেন না! স্বামীর ব্যবহারে প্রভাবতীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল: তিনি নানা প্রকার মনকষ্টে কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন। রায়গিন্নী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—কাঁদিস্ নে ভাই! কাঁদিস্ নে—তুই যে রকম মেয়ে—তোর এ কষ্ট কিছুতেই থাক্‌বে না, ভগবান্ যদি সত্যের হন ত একটা কিনারা হবেই,—এই বলিয়া রায়গিন্নী আঁচলে প্রভাবতীর চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন! প্রভাবতী ঠান্‌দির পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন—ঠান্‌দি, মনে রেখো, যেখানেই যাই—তোমাদের ভালবাসা কখন ভুল্‌বো না?

ঠান্‌দি। তোরা গেলে দিন কতক আমার ত পাড়ায় টেকা দায় হবে—দুপুর বেলা আমার বেড়ানই বন্ধ হবে দেখছি?

বাস্তবিক রায়গিন্নী বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী ছাড়া আর কাহারও বাড়ী বেড়াইতে যান না। প্রভাবতী ছাড়া এমন মোলায়েম সরল কথা আর কাহারো কাছে শুন্‌তে পান না বলিয়া তিনি প্রত্যহ প্রভাবতীর কাছেই আসিতেন। আজ তাঁহার পাড়া বেড়ানর আনন্দ চিরতরে ঘুচিয়া যাইবে বলিয়া তিনি প্রাণে যারপর নাই আঘাত পাইলেন। কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও সমস্ত দিন তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কাতর অন্তঃকরণে সন্ধ্যাবেলা গৃহে গমন করিলেন।

৯

গ্রাম পরিত্যাগ করাই যখন সাব্যস্ত হইল, তখন আর কেন, দামুঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জমীজমা বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। অমন চোটের জমি বিক্রয় করিতে, তাহার ক্রেতা সংগ্রহ করিতে দামুকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। দুইচার দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া জমী বিক্রয় করতঃ করুণাময়ের ঋণ পরিশোধ করিল।

কুসুমপুর গ্রামের প্রতি, তাহার অধিবাসিগণের প্রতি দামুর কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। যে গ্রামে নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের উপর কাহারো নজর নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে, কেহ সাহায্য করিতে আসিলেও তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য উঠিয়া

পড়িয়া লাগে, সে গ্রাম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, তাই সেও নিজের সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিল। চাষ-আবাদ যাহা ছিল তাহারও স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিল। পাড়ায় যাহারা বিপক্ষ ছিল, তাহারা প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—বেটা আগুরী এইবার মোরবে, বামুণীর পীরিতে পড়ে শেষে হাড়ির হাল হবে, চাট্টি ভাতের জন্য মারা যাবে; এমন সোনার জমীগুলো আদা দরে বিক্রয় করে ফেল্‌লে গা; পীরিতে পড়ে ব্যাটার ঘাড়ে ভূত চেপেছে!

দামু ঘোষ তাহা শুনিয়াও শুনিল না, কোন প্রকার রাগ করিল না, সমস্ত অপবাদ সে ভগবানের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিল। দামু চাষার ছেলে বটে, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াছিল, হৃদয় উচ্চ ভাবে গঠন করিয়াছিল বলিয়া সে এখনকার মত ভ্রষ্টাচারী হয় নাই। তাহার রূপ ছিল, গুণ ছিল—তথাপি চাষার কাজই করিত, শিক্ষিত হইয়া কখন ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নষ্ট করিত না বা ঠাকুর-দেবতায় পূজা করিতে যাইত না, ঋষিবাক্য অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই মানিত এবং শাস্ত্রের শাসনবাক্য কখন অমান্য করিত না!

আজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শিক্ষা পাইয়া এবং তদীয় গুরু দেবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তন্ত্রের সাধন-ভজন করতঃ সে এমন কর্ম্মী, এমন ধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছিল যে অনেক সাধক বহু বৎসর সাধনা করিয়াও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। গুরুদেবকে সে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়াই শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার বাক্য দেববাক্য বলিয়া মানিয়াই দামু এত বড় হইয়াছিল—হৃদয় এরূপ উচ্চ-ভাবে সংগঠন করিয়াছিল! এই জন্য সে লোকের কথায়, তাহাদের

কুৎসা রটনায় ভয় পাইত না ; লোক-লজ্জায় সে কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত না।

গুরু দেবানন্দের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দামু ঘোষ যখন করুণাময়ের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রভাবতীর মাসীর বাড়ী কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন পাড়ার তুই একজন মাতব্বর লোক প্রমথ মুখুয্যের ছেলে প্রভাসের সহিত গৌরীর বিবাহ দিবার জন্য ধরিয়া বসিল, বলিল—প্রভাসের সহিত বিয়ে দিলে আর তাহাদের গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে না বরং প্রভাবতীর শেষ জীবনটা খুব সুখে কাটিবে। প্রমথ বাবু বড় জমীদার, তাঁর ছেলেও কলেজে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। প্রমথ বাবু এক পয়সাও চান না, এ বিবাহ হইলে গৌরীরও যে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। হাজার গোপন রাখা হউক, দামুঘোষ ও প্রভাবতী কিন্তু প্রভাসের লেখাপড়ার দৌড়, তাহার গুণের কথা সমস্ত শুনিয়াছিল। চরিত্র-হীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা না করা সমান—কেবল অর্থ লইয়াও কেহ ধুইয়া খাইবে না, কেবল অর্থই পবিত্র প্রণয়রাজ্যের সুখোৎপাদকও নয়, কাজেই তাহারা রাজী হইল না।

সাপের মাথায় লাঠী মারিলে সে যেমন ফোঁস করিয়া দংশন করে। গরীব লোক বড় লোকের মর্য্যাদার হানি না করিলেও সেইরূপ জলিয়া উঠে, তাহার ভিটে-মাটী চাটী করিয়া সর্ব্বনাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে! প্রভাবতীও দামুঘোষ যখন প্রভাসের সহিত গৌরীর বিবাহ দিতে রাজী হইল না তখন প্রমথ মুখুয্যেও রাগে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ছেলের

গুণ ত তিনি জানেন, কাজেই বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া ভিতরে ভিতরে তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টার বিষম ফাঁদ পাতিলেন।

প্রভাস কিন্তু গৌরীকে না হইলে আর বিবাহ করিবে না, সে গৌরীর প্রতি এমন ঢলিয়াছে, এমন আসক্ত হইয়াছে যে, সে মায়ের কাছে স্পষ্টই বলিয়াছে—যদি গৌরীর সহিত আমার বিবাহ দাও তাহা হইলে আমি আর বদ্মায়েসী করিব না, শান্তশিষ্ট হইয়া তোমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিব। কিন্তু বিবাহ হয় কেমন করিয়া, দামুর ও প্রভার ত একান্ত অনিচ্ছা, তাহার উপর গৌরী প্রভাসের নাম শুনিলে ভয়ে কাঁটা হয়, চাঁদ মুখ মলিন হইয়া যায়, কোন কথা বলে না বটে কিন্তু নীরবে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করে। সে বড় লোকের ছেলের সহিত বিবাহিতা হইতে আদৌ রাজী নহে। বড় লোকের টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় নাই—ধর্ম্মকর্ম্মে তাহারা আস্থাবান্ নহে—খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অবাধে বহু অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন—বলিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই অনর্থ হইবে।

গৌরী যেমন দরিদ্রের কন্যা তেমনি একটী সচ্চরিত্র শিক্ষিত দরিদ্র যুবকের সহিত বিবাহ হইলে সে আজীবন সুখী হইতে পারিবে—বিশুদ্ধ চরিত্রইত সুখের নিদান। সে বাহ্যিক সুখের তত প্রত্যাশিনী নহে—যত অন্তরের। চরিত্রহীন ধনবান্ পাত্রে আত্ম-সমর্পণ করিয়া অনুদিন কেবল আসঙ্গলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া এমন দুর্ল্লভ নারীজন্ম নষ্ট করিতে গৌরী চায় না, সে চায় ধার্ম্মিক-স্বামী—তাহাতে যদি একবেলা শাকান্ন খাইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি বাহ্যিক সুখের রাজরাণী হইতে বাসনা তাহার নাই।

প্রমথ মুখুয্যের অযাচিত সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রভাবতী আর গ্রামে রাত্রি যাপন করিতে সাহস করিলেন না। কি জানি তিনি বড়লোক, যদি রাগের বশবর্ত্তী হইয়া রাত্রে তাহার কন্যার উপর কোন অত্যাচার করেন। ছেলেটাও এক রকমের, যদি আশায় নৈরাশ হইয়া রাত্রে একটা কেলেঙ্কারী করিয়া বসে—এই ভয়ে প্রভাবতী দামু দাদাকে সেই দিনই কলিকাতা যাইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল।

যখন সকল প্রকার দেনা শোধ হইয়াছে, দামুও নিজের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া হাতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? পাড়ায় যাহারা তাহাদের বন্ধু ছিল, তাহাদের নিকট বিদায় লইল। ইহাদের মধ্যে রায়গৃহিণী ভবতারিণী এবং রামধন কবিরাজই প্রধান; তাঁহারা প্রভাবতীর ও তদীয় কন্যা গৌরীর সহিত পরোপকারী যুবক দামুঘোষের গ্রাম ত্যাগে দুঃখিত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। ভবতারিণী বাস্তবিক দারুণ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—প্রভা! ভগবান্ মেরে রেখেছেন তাই, নইলে কি করুণার মেয়েকে আমি এমন করে দুঃখের জ্বালায় গ্রাম ত্যাগ কর্ত্তে দিই?

প্রভাবতীও কাঁদিতেছিল, জন্মভূমি যে সকল পুণ্যতীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী, তাহার অধিবাসিগণও যে এই পুণ্যতীর্থের পবিত্রতাময় সহযাত্রী তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোন্ অজানিত স্থানে যাইতে তাহার প্রাণ আকুলি বিকুলি করিল, দুঃখে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে ভবতারিণীর পায়ের ধূলা খাইল; ভবতারিণী তাহার চুমা খাইয়া বলিলেন—দিদি! আমি শীঘ্র তোর

মনের মত বর ঠিক করে দিচ্ছি—তোর মায়ের ভাবনা দূর করবার চেষ্টা করছি। ইহার পর প্রভাবতী আসিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া ভবতারিণীর পায়ে দণ্ডবৎ করিল; তিনি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—জামাই যেন শীঘ্র তোর সন্ধান লয় মা ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি। তার পর দামু ঘোষ, কবিরাজ মহাশয়কে আলিঙ্গন করতঃ ভবতারিণীর পায়ে পড়িল। ভবতারিণী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—দামু! তুই যখন ইহাদের ভার লইয়াছিস্—তখন এক যম ছাড়া প্রভা ও গৌরীর কোন ভয় নাই ভাবিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি; যা ভাই! যেখানে থাকিস্ সময়ে সময়ে আসিয়া দেখা করিস্; লোকে যে যা বলে তাতে কান দিস্‌নে, কর্ত্তব্য কাজ করে যাস্—তা হ'লে ভগবানের কাছে খাঁটি থাক্‌বি! হাঁ ঠানদি, তুমি সেই আশীর্ব্বাদই কর—যেন ধর্ম্মে পতিত, কর্ত্তব্যে চ্যুত না হই। এই বলিয়া দামু, প্রভাবতীও গৌরীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে গোযানের সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিল। রামধন কবিরাজ তাহাদের সহিত ষ্টেশন অবধি পেঁাছিয়া দিতে আসিল। আজ একটি বহু প্রাচীন বংশের সহিত কুসুমপুরের সকল সম্পর্ক রহিত হইল। যাহারা তাহাদের ভালবাসিত; তাহারা প্রভাবতী, গৌরীও দামুকে বিদায় দিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, আর যাহারা তাহাদের চক্ষের বিষ বলিয়া মনে করিত, অহরহঃ তাহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিত—তাহারা এক পক্ষে হতাশ হইল—এক পক্ষে সুখে হুলাহুলি দিতে লাগিল।

১০

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলে সকলের প্রাণেই একটা ব্যথা অনুভূত হয়। প্রভাবতী ও গৌরী কলিকাতার কাশীপুরে মাসীর বাটী আসিয়া প্রথম প্রথম কয়েকদিন অত্যন্ত মনমরা হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর মাসী-কমলমণির আদর আপ্যায়নে ক্রমশঃ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গৌরী আবার হাসী খেলায় এবং প্রভাবতী আবার গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া একপ্রকার সুখে দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিয়াই দামু মেট্রোপলিটনের ছাত্র, করুণাময়ের সেই প্রিয়শিষ্য রমণীমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। রমণী তখন এফ এ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত বৃত্তি পাইয়া বি, এ, পড়িতেছিল। কলিকাতার সমস্ত বিষয় তাহার যত জানা আছে—দামুর তত নাই। কারণ দামু সুশিক্ষিত হইলেও কলিকাতায় তত বেশী যাওয়া আসা করিত না, তবে পথ ঘাট যে একবারে অজানিত, তাহাও নহে।

পূজনীয় ডাক্তার মহাশয়ের পুত্রী ও দৌহিত্রী পাড়ার লোকের জ্বালায় কলিকাতায় আসিয়াছেন; দেশের সমস্ত বিষয় আশয় দেনার দায়ে বিক্রয় করিতে হইয়াছে—শুনিয়া রমণীমোহন মর্ম্মাহত হইলেন। স্বর্গীয় করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত থাকিতে রমণীমোহন কয়েকবার কুসুমপুরে গিয়াছিলেন, সেই সময় দামু ঘোষের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল।

"রতনেই রতন চিনে" রমণী মোহন বুঝিয়াছিল দামু ঘোষ উগ্রক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও ইহার হৃদয় অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উচ্চভাবে

গঠিত ; এরূপ লোকের ছায়া পাইলে জগতে অনেক মহৎ কাজ করা যায়। দামুকে পাইয়া রমণীমোহন বিশেষ আপ্যায়িত হইলেন ; তাহাকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন—ভাই! যখন পাড়ার লোক বিনা দোষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত অমন সাধু ব্যক্তির প্রতি এরূপ বিরূপ তখন তাঁহার অবিদ্যমানে তাঁহার পুত্রী ও দৌহিত্রী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ভালই করিয়াছ ; বেশীদিন থাকিলে হয় ত একটা বিষম অনর্থ বাধাইয়া দিত। তুমি একজন মহৎ লোক, দুইটী নিরাশ্রয় রমণীর জন্য চেষ্টা করিলে ভগবান নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সদয় হইয়া তাহাদের অকূলে কূল দিবেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। আমাকে তুমি যেরূপ সাহায্য করিতে বলিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিব। তবে আমার আর্থিক অবস্থা ত তুমি জান ! বহুকষ্টে কলিকাতায় ছেলে পড়াইয়া নিজের পাঠের খরচ ও দেশে জননীর খরচ চালাইয়া থাকি। এবার হইতে আমাদের খরচ ও না হয় কম করিয়া যাহাতে প্রতিমাসে ২।৪ টাকা সাহায্য করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দয়া আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না ! কলিকাতায়—ডাক্তারী করিবার সময় তাঁহার মত একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আমার পীড়ায় আপনার ছেলের মত চিকিৎসা করিয়া নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন, অনেক অভাব অভিযোগ পূরণ করিয়াছেন, তিনি না থাকিলে, কিছুতেই আমি এত দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না, তাঁহার অনকোচিত সাহায্য কি জীবনে ভুলি ? ভাই ! তুমি যে টাকা আনিয়াছ, তাহা সঙ্গে না রাখিয়া তাহার দ্বারা একটা সামান্য কাগজ কলমের দোকান কর—আমি কলেজের ছাত্রদের দ্বারা তোমায় সাহায্য করিব।

রমণী মোহনের ন্যায় উদার প্রকৃতি, স্বাধীনচেতা যুবকের উৎসাহ বাক্যে দামু ঘোষ তাহাই করিল—তাহার দোকানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রমণী মোহন অবসর পাইলে সময়ে সময়ে কাশীপুরে যাইতেন, প্রভাবতীর পদধূলি লইতেন। প্রভাবতী এই শান্তশিষ্ট শিক্ষিত যুবকটীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রমণী মোহনের গুণের তুলনা ছিল না। পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তিনি হিন্দুর আদর্শ ছিলেন। সকল আচার বিচার, দেব দ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা তাহার চরিত্রগত গুণ ছিল। তারপর বিনয়ের ত কথাই নাই। বৃক্ষ ফলভরে ভারী হইলে যেমন সদাই নত হইয়া থাকে, রমণী মোহন লেখাপড়া শিখিয়া, বিদ্যাভারে ভারগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদাই সেইরূপ নত হইয়া থাকিতেন। তাহার যেমনি রূপ, গুণও তেমনি—যাই যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

রমণীমোহন কুলীন নহেন—মৌলিক, কিন্তু যে সকল মহৎ গুণ দেখিয়া বল্লাল সেন কুলীনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই যুবকে সে সকল গুণ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তথাপি ইনি মৌলিক, আর যিনি একেবারে গুণহীন অপদার্থ—তিনি কুলীন! এখন কৌলীন্য জাতিগত হইয়াছে বলিয়াই লোকে জাতি যাইবার ভয়ে এমন অপাত্রে পাত্রী ন্যস্ত করিয়া মনে করে—জাতি রক্ষা হইল। কিন্তু সেরূপ কুলীন অপেক্ষা রমণীমোহনের মত মৌলিকে কন্যা দান করিলে যে কন্যার পিতার চৌদ্দ-পুরুষ স্বর্গগত হইবেন—সে বিষয়ে আর ভুল নাই। তবে এ জাতির জাতীয় সংস্কাররূপ মহাভ্রম ত এখন দূর হয় নাই, তাই রমণীমোহনের মত সৎ পুত্র এখনও অবিবাহিত, আর অনাথের মত পাষণ্ড গুণহীন কতক

গুলি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অবাধে তাহার পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিতেছেন। কিন্তু রমণীমোহন পোড়ো ছেলে বলিয়া তাঁহার জননী বিবাহের কোনও চেষ্টা করেন নাই, নতুবা এমন সোনার টুকরা ছেলের কি আবার বিবাহের ভাবনা ?

রমণীমোহন যখন দামুর সহিত কাশীপুরে প্রভাবতীর মাসীর বাটী আসেন, গৌরী তখন ঘরের মধ্যে চলিয়া যায়, আড়াল হইতে সে রূপ-মাধুরী দেখিয়া চক্ষের পলক ফেলিতে পারে না, তাই প্রেম-প্রোজ্জ্বল-নয়নে, ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে প্রাণে প্রাণে ভবিতব্য বিধাতার নিকটে এইরূপ সর্ব্বগুণাধার যুবকের পদে আত্ম সমর্পণ করিয়া নারী-জন্ম সফল করিবার প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু হায় ! তাহা কি হইবে ? রমণী-মোহন যে অতি বংশজ—মৌলিক, আর তাহারা যে মুখ্য কুলীন ! ছার কৌলিন্য, বল্লাল ! কেন তুমি নারীজাতির সর্ব্বনাশ করিতে এ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলে ?

মাসীমাতা কমলমণি বোন্-ঝি প্রভাবতী ও তদীয়া কন্যা গৌরীকে বিশেষ স্নেহ-যত্ন করেন, দামু ঘোষও বাদ যায় না, সে সমস্ত দিন কলি-কাতার কলেজ ষ্ট্রীটে দোকান করে, তারপর রাত্রে তথায় গমন করিয়া একসন্ধ্যা চারিটী আহার করে—প্রাতঃকালের আহার হোটেল ভিন্ন উপায় নাই। প্রভাবতীও গৌরীকে সে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারে না, পাছে এই অবলা নিরাশ্রয়া রমণীদ্বয় কাহার দ্বারা নির্য্যিত বা বিপদগ্রস্ত হয়। গৌরীর বিবাহ দিয়া স্বামীর গৃহে পাঠাইতে পারিলে এবং প্রভাবতীকে হয় তাহার কুলীন স্বামীর নিকট, নতুবা আরও কিছু বয়স হইলে গুরুদেব দেবানন্দের চরণতলে রক্ষা করিয়া সে জীবনের অন্যান্য কাজে মনো-

নিবেশ করিবে—এই আশা, কিন্তু এই আশার আশ্বাসে সে আর কতকাল থাকিবে! কিন্তু আমরা বলি—দামু! তুমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে কর্ম্মের ভার লইয়াছ, ইহা অপেক্ষা মহৎ কর্ম্ম আর নাই—এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারিলে, পরের জন্য এইরূপ কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারিলে এবং এইরূপ কর্ম্মযোগে যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করিতে সক্ষম হইলে তোমার সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য হইবে, তোমার জীবন ধন্য হইবে, তোমার আর কোন কর্ম্মের প্রয়োজন হইবে না, ইহাতে অন্তিমে তুমি কর্ম্মময় শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ফল সমর্পণ করিয়া নিষ্কর্ম্ম হইয়া জীবন জুড়াইতে পারিবে।

এখন বিষম চিন্তা হইয়াছে—গৌরীর বিবাহ, তাহাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিলে আর ভদ্রস্থতা নাই। সে বয়সের স্বধর্ম্মে না হউক, দৈহিক বাড় বাড়ন্তে এত বড় হইয়া উঠিতেছে যে আর তাহাকে অনূঢ়া রাখা চলে না। কাজেই হিন্দুর গৃহে ইহার জন্য আত্মীয় স্বজনের ভাবনা হইবারই কথা; তাহার উপর সমাজও ক্রমশঃ যেরূপ কঠিন হইতেছে, বিবাহে পণপ্রথা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে দরিদ্রের কন্যার বিবাহ হওয়াই দায়! স্ববর, ভাল বর এবং কন্যাটীর ভবিষ্যৎ সুখের আশা করিয়া দেখিয়া শুনিয়া দিতে হইলে—প্রভাবতীর যে অবস্থা তাহাতে গৌরীর বিবাহ হয় না। আজকাল কর্ম্মিষ্ঠা, গুণবতী, রূপসী পাত্রীরও বিনা অর্থে বিবাহ হয় না? বিশেষতঃ আজকাল সমাজ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, পাত্রের পিতা যেরূপ শাণিত খড়্গ ধারণ করিয়া কসাইয়ের মত ব্যবহার করিতেছে—তাহাতে হায়! দরিদ্রা কুমারী পরিশেষে তোমার কি দুর্গতি হইবে—ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়!

১১

জগতে কাজ কর্ম্ম শিখিতে হইলে হয় দেখিয়া না হয় ঠেকিয়া শিখিতে হয়। প্রভাবতী কর্ম্মক্ষেত্রে কাহার দেখিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই; পদে পদে বাধা পাইয়া—ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে শিক্ষা করিয়াছেন, তাই তিনি সংসার কার্য্যে এত পাকা হইয়াছেন। দেখিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা, অভাবের প্রভাবে পড়িয়া ঠেকিয়া শিক্ষা করিলে তাহা বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া যায়, জীবনে আর কখনও তাহা ভুলিয়া যাইবার ভাবনা থাকে না। অভাবের সংসারে কেমন করিয়া স্বভাব আনিতে হয়, কেমন করিয়া তাহাকে ঠিক স্বচ্ছল সংসারের মত চালাইতে হয়, এক দিনের জিনিস কেমন করিয়া তিন দিন করিতে হয়—অভাবে না পড়িলে সহজে কেহ তাহা করিতে পারে না বা তাহা জানিবার সুযোগ হয় না। এই জন্য অভাবই—স্বচ্ছলতার জনক—অভাব না হইলে পূরণের চেষ্টা মনোমধ্যে জাগে না বলিয়া মহাজনেরা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রভাবতী বাল্যেই মাতৃহীনা পিতার পরম যত্নে যথেষ্ট লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন—ধর্ম্মজ্ঞান তার যথেষ্ট, কিন্তু অপর কেহ না থাকায়—যৌবনে শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট ও সাংসারিক কোন বিষয় সাহায্য না পাওয়ায় তিনি পিতার সেবার জন্য রোজ রোজ রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া কোন দিন সুখ্যাতি, কোনদিন অখ্যাতি লাভ—করিয়া কিছুদিনের পর বুদ্ধিবলে রন্ধন কার্য্যে খুব পাকা হইয়াছিলেন; এখন আর তাঁহার কোনপ্রকার রন্ধনই আটকায় না

এবং অতি পরিপাটিরূপে রাঁধিতে পারেন—যাহা খাইলে রসনা পরিতৃপ্ত হয়। সংসারের অপরাপর কার্য্য তুলনাহীন। নিজের দরিদ্র সংসারে পরিপক হস্তে তিনি সমস্ত দ্রব্য এমন সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখেন, যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। বড় লোকের ঘরে অতি মূল্যবান দ্রব্য অপরিপক হাতের তাড়নায় এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত হয় না।

গৌরী এই মায়ের নিকট শিক্ষিত হইয়া সংসার কার্য্যে কিরূপ সুনিপুণ হইয়াছে তাহা সহজেই বিবেচ্য। আজকালকার শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই অলস, সংসারে পরিশ্রমের কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, কিন্তু প্রভাবতী ও গৌরী প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মাসীমার সামান্য গৃহে বেশী কিছু করিবার না থাকিলেও যাহা আছে তাহাতেই তাঁহারা সাতিশয় ক্ষিপ্র হস্তে ও এমন নিপুণতার সহিত সমাধা করিতেন, তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। এই সামান্য গৃহস্থালীর শীতল ছায়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ জুড়াইতে সকলের প্রাণ চায়।

প্রভাবতী গৃহদেবতা বিষ্ণু ঠাকুরের পূজা-গৃহ এমন সুন্দরভাবে—পরিষ্কার রাখিতেন—যাহা দেখিলে অতি বড় নাস্তিকেরও সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পূজারম্ভ হইতে সাধ হইত। মাসীমাতা প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন কিন্তু প্রভাবতী এখানে আসিয়া অবধি একদিনও সুরধুনি গর্ভে স্নানার্থ গমন করেন নাই, বয়সের অল্পতাহেতু হউক বা লজ্জা বশতই হউক অথবা কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে, বলিয়াই হউক, তাহাকে একাকী গৃহে রাখিয়া বা লইয়া যাইতে তিনি

ইচ্ছা করিতেন না। কোন পালপার্ব্বণে মাসীমাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—মাসীমা! যাঁর পায়ে গঙ্গার উদ্ভব আমি যখন তাঁহার সেবায় প্রাণপাত করিতেছি—তখন গঙ্গাস্নান না করিলেও কি তিনি অন্তিমে এ অভাগিনীকে পদাশ্রয় দিবেন না? বোনঝির এই প্রাণের তেজ-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া কমলমণি আর, কোন কথা কহিতে পারিতেন না।

দামু ঘোষ প্রভাবতীকে লইয়া দেশত্যাগ করায়, গ্রামে অনেক কথা রটিয়াছে; অনেকে প্রভাবতীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছে, কিন্তু লোকের ভালমন্দ, প্রশংসা অপ্রশংসার কথা তাঁহারা বড় গ্রাহ্যও করেন না। তাঁহারা জানেন—ভগবানের কাছে, ধর্ম্মের কাছে খাঁটি থাকিলেই হইল। দামু গুরুকন্যা বলিয়া প্রভাবতীকে বড় ভগ্নীর মত মান্য করিত; ইহা ছাড়া পাড়ার বিপদে আপদেও দামু অগ্রণী হইয়া কার্য্যোদ্ধার করিত; তাহার আত্মপর ভেদ ছিল না। বিশ্বেশ্বরী মায়ের সৃষ্ট প্রাণী সকলেই তাহার আপনার—দামু এইরূপ নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক,—তবে প্রভাবতীও গৌরীর প্রতি তাহার প্রাণের টান কিছু বেশী ছিল।

গৌরী এখন আর খেলায় সময় নষ্ট করে না, এখন সে মায়ের সহিত সমস্ত দিন সংসারের কাজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গোসেবা, দেবসেবা রন্ধন, শয্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য প্রাণপণে শিক্ষা করিতেছে—হিন্দুর মেয়ের যে সকল নিত্য আবশ্যক সে সকল শিক্ষা করিয়া রাত্রে আহারাদির পর কোনদিন রামায়ণ, কোনদিন মহাভারত, কোনদিন বা শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি পাঠ করিয়া, মা ও দিদিমাকে শুনাইত। উপযুক্ত শ্রোতা জননী ও দিদিমা যখন দুর্ব্বোধ্য স্থান সকল বুঝাইয়া দিতে বলিতেন, বালিকা

গৌরী তখন তাহা এমন সরলভাবে বুঝাইয়া দিত যাহা শুনিয়া শ্রোতৃদ্বয় অবাক্ হইয়া থাকিতেন—বালিকার অসীম বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিতেন।

এইবার গৌরীর বিবাহ লইয়া খুব চেষ্টা হইতে লাগিল। আর বিবাহ না দিলে কিছুতেই মুখ দেখান যায় না। তবে অপাত্রে যে গৌরী দান করিতে হইবে—তাহাও প্রভাবতীর ইচ্ছা নাই। দামু চারিদিকে পাত্র অন্বেষণ করিতেছে, রমণীমোহনও নিশ্চিন্ত নাই, তিনিও কলেজের ছুটীর পর—এখান সেখান করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু সামান্ত দুই তিন শত টাকায় পাত্র সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন, তাই এত চেষ্টায়ও কোন ফল হইতেছে না। পাত্রী দেখিয়া সকলেই পছন্দ করিতেছে কিন্তু দেনা-পাওনার বেলা কাহারও মন উঠিতেছে না।

প্রভাবতী অনন্যোপায় হইয়া এইবার প্রসূতি চিকিৎসার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই উপায় অবলম্বনে যেন দিন দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে প্রসূতি প্রসব হইতে কষ্ট পাইতেছে—প্রসব হইয়া যাহার সন্তান রুগ্ন হইতেছে, প্রভাবতী কমলমণির সহিত তথায় যাইয়া সামান্ত মাত্র ঝাড়ফুক করিলে, বা সামান্ত মাত্র মুষ্টিযোগ প্রদান করিলেই আশাতীত ফল হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রসার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া গেল। অর্থ উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইতে লাগিল।

মহাপুরুষ দেবানন্দের সেই অমোঘ আশীর্ব্বাদে প্রায় ছয় মাসের মধ্যে কাশীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে প্রায় হাজার টাকা উপায় হইল। প্রভাবতী এইবার সাহস করিয়া দামুদাদাকে বলিলেন—ভাই!

আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না, ভাল করিয়া চেষ্টা কর; গৌরীর অদৃষ্ট বোধ হয় সুপ্রসন্ন, টাকার অভাব হইবে না।

প্রভাবতীর কন্যাদায়ে রমণীও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন; সে সদাই চিন্তা করে মনোমত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়। প্রভাবতী যখন হাজার টাকা খরচ করিতে পারিবে শুনিলেন, তখন একদিন দামুকে লইয়া দেবীপুরে তাহার বন্ধু উমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নিকট গমন করিলেন। উমানন্দ, দেবীপুরের শশধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, সম্প্রতি বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছে, বাপেরও কিছু আছে; একান্ত উপায় উপার্জ্জন করিতে না পারিলেও ভাত কাপড়ের অভাব হইবে না। রমণীমোহনের সহিত তাহার বিশেষ সদ্ভাব আছে; তাহার পিতা শশধর বাবুও লোক অতি সজ্জন, দেখা যাক কি হয়।

দামু ও রমণীমোহন একদিন দেবীপুরে যাইয়া প্রথমে উমানন্দের সহিত দেখা করিল। দুই বন্ধুতে কত হাসি তামাসার পর উমানন্দ বলিল—ভাই আমার ত এখন বিবাহের ইচ্ছা নাই : তবে এ বিষয় পিতা মাতার ইচ্ছাধীন, তুমি তাঁহাদের মত গ্রহণ কর। উমানন্দের তাদৃশ অমত নাই দেখিয়া রমণীমোহন ও দামু ঘোষ শশধর বাবুর নিকট প্রস্তাব করিল। শশধর বাবু অতি নিরীহ ভদ্রলোক, তিনি পুত্রের পিতা বলিয়া কন্যাপক্ষের সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন না। এ বিবাহে কোন প্রকার চাপ দিলেন না; কারণ তাঁহাদের ত তাদৃশ অভাব নাই; তেজারতি ও চাষ আবাদ যাহা আছে, একটা ছেলে রাখিয়া খাইলে আজীবন সুখে কাটাইতে পারিবে। পুত্রও যথেষ্ট লেখা পড়া শিখিয়াছে—উকিল হইলে সে কিছু উপায় করিতে পারিবে, তাহাও নিঃসন্দেহ : তবে আর দরিদ্রকে

পীড়ন করিয়া লাভ কি ? কুটুম্বের ধনে কে কোথায় বড়লোক হইয়াছে ? মেয়েটা যখন খুব ভাল, তখন আর অমত রহিল না; সমস্ত ঠিক করিয়া রমণীমোহন ও দামু ঘোষ হাসিতে হাসিতে বিদায় হইল।

—•—

১২

আজ আমাদের গৌরীর বিবাহ। হঠাৎ সম্বন্ধ পাকা হওয়ায় কোন লোক জানাজানি হইল না। কমলমণির আবাস গৃহ আজ গৌরীর বিবাহে সামান্ত রকম আনন্দমুখর হইয়াছে ; প্রভাবতী পাড়ার কয়েকজন সধবা স্ত্রীলোকে লইয়া বিবাহের সকল প্রকার আয়োজন করিতেছেন, আর এক একবার চক্ষের জল আঁচলে মুছিয়া মনে করিতেছেন—যাঁর মেয়ে আজ তিনি কাছে থাকিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলে কি সুখেরই হইত ? কিন্তু যাহা হউক যখন আমার ন্যায় সামান্ত নারী এই সামান্ত দিনের মধ্যে এত টাকা সংগ্রহ করিয়া অমন সুপাত্রে তাঁহার কন্যাকে সম্প্রসান করিতে পারিতেছে; তখন ইহাতে তাঁহার—আশীর্ব্বাদ যথেষ্ট আছে—স্বামী দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন এ জগতে স্ত্রীজাতির ক্ষমতা কোথায় ! প্রভাবতী মনে• মনে স্বামীচরণে ভক্তি নতি করিয়া তাঁহারই কাজে প্রাণমন ঢালিয়া দিতেছেন। দামু ঘোষ ও রমণী মোহন সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসর সাজাইতেছে ; বরযাত্রীদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেছেন রমণী মোহন আজ আর মেসে যাইবার সময় পান নাই, তিনি যাইলে এ সকল কার্য্য করে কে ? দামু একাকী আর কত করিবে, বিশেষতঃ

সে শূদ্র, আহারাদির ব্যবস্থা বা পূজাদির ব্যবস্থা ত আর তাহার দ্বারা হইবে না ; কাজেই প্রভাবতীর অনুরোধে রমণী প্রাতঃকাল হইতেই সমস্ত করিয়া দিতেছে।

বিবাহের তুল্য আমোদ আর কিছুতে নাই। যাহার বিবাহ, তাহার ত কথাই নাই, যাহারা ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাঁহারাও অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু হায়! একি, গৌরী আজ এত নিরানন্দ কেন? চাঁদ মুখ এত ভার ভার-তাহাতে হাসির নাম মাত্র নাই কেন? যে মুখ সদাই প্রফুল্ল থাকিত, এত কষ্টে, এত অপালনে যাহার মুখ তিলেকের জন্য ও অপ্রসন্ন থাকিত না, আজ এ আনন্দের দিনে তাহা এত স্ফুর্ত্তি-বিহীন কেন? সকলে বলিতেছে—সমস্ত দিন উপবাস করিয়া গৌরীর কষ্ট হইয়াছে বলিয়াই, তাহার মুখে হাসি নাই, মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা বলি তাহা নহে উপবাস ইহার কারণ নহে। দরিদ্রার কন্যা গৌরীর উপবাস ত অনভ্যস্ত নহে—কুসুমপুরে তাহার দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর এমন উপবাস ত তাহাকে অনেক দিন সহ্য করিতে হইয়াছে। কই, তাহাতে ত গৌরী এত বিষণ্ণ, এমন মনমরা—আত্মহারা হয় নাই। গৌরীর স্ফুর্ত্তিহীনতার কারণ তাহা নহে, যে পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে সে পাত্র তাহার তাদৃশ মনোমত হয় নাই। যদিও উমানন্দ পাশ্চত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র তথাপি সে অনাচারী—আহার বিহারে সে হিন্দুর মত বাঁধাধরা নিয়ম প্রতিপালন করে না। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাহ্নিকে সে বীতশ্রদ্ধ—যাহা পায় তাই খায়। হিন্দু ললনা পরম নিষ্ঠাবতী গৌরীর কাছে তাহা যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে তাই গৌরী তাহার

সহিত মিলিত হইতে যেন কতই কুণ্ঠিতা! তবে প্রভাসের ন্যায় চরিত্রহীনের সহিত বিবাহ বিষয়ে যে ভগবান রক্ষা করিয়াছেন—ইহার জন্য সে তাঁহার পদে শতবার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। স্বামী অনাচারী হইলে না হয় পায়ে ধরিয়া তাহাকে নিষেধ করিবে—অকপট অনুরাগে তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে শিক্ষিত স্বামী কি দাসীর এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিবেন না? কিন্তু রমণীমোহনের মত আদর্শ হিন্দুযুবকের করে যদি দেহমন সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবন ধন্য হইত। কিন্তু হায়! এমন রত্ন, গলায় গাঁথিয়া পরিবার উপায় কোথায়? তাঁহারা যে মৌলিক, আর গৌরী যে ছার কৌলিন্যে আটক পড়িয়া আছে! ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে—গৌরীর মনোকষ্টের কারণ ইহাই।

সমস্ত দিন বেশ আনন্দ উৎসবে কাটিয়া গেল। গৌরীর সঙ্গিনীগণ তাহার বেশভূষা করিয়া দিল। গৌরী স্বভাবতই পরমা সুন্দরী, তার উপর বিবাহের সাজ সজ্জা পরিয়া আজ তাহার রূপ তুলনাহীন হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় রমণী কণ্ঠেক্ষণে ক্ষণে হুলুধ্বনি ও মঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি উদগীর্ণ হইয়া শ্রবণ বিবর পরিতৃপ্ত করিতেছে। বাহিরের আসর রমণী মোহন ও দামু ঘোষ নানাবিধ মাঙ্গলিক ফলপুষ্পে নয়নমনোহর রূপে সজ্জিত করিয়াছেন। বালকবালিকাগণ বর দেখিতে আসিয়া নানাবিধ কলরব করিতেছে।

আজ রাত্রে বিবাহের দুই লগ্ন, একটী সন্ধ্যার পর রাত্রি নয়টার মধ্যে, আর একটী রাত্রি একটার পর দুইটার মধ্যে। সুতহিবুক লগ্নে বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতে পঞ্জিকাকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু সুপ্রসন্ন পুত্র

কন্যার রাশি অনুসারে প্রথম লগ্নেই বিবাহ হইবে। আর বরযাত্রীগণ আহারাদি করিয়া সেই দিনই বাড়ী ফিরিবে অন্যথায় থাকিবার স্থানাভাব, এ দরিদ্র পল্লীতে তেমন কাহার বাস ভবন নাই যে একশত জন লোকের সমাবেশ হইতে পারে। এই জন্য পাছে লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, পাছে লোকজনের কষ্ট হয় রমণীমোহন ও দামু ঘোষ তাহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। গুরুদের দেবানন্দ ভট্টচার্য্যের জামাতা—পুরোহিত রূপে বিবাহ বাটীতে উপস্থিত : সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছেন কখন বর আসিবে ?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল—বর আসিল না, পরন্তু একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল—বর আসিবে না, কন্যার মায়ের চরিত্রগত দোষ আছে শুনিয়া, তাঁহারা অন্যত্র পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। দেবীপুরের স্বনাম ধন্য কুলীন শশধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমানন্দের বিবাহ জানিয়া শুনিয়া এমন একটা নীচ বংশে হইতে পারে না বলিয়া সমাজপতিরা মত প্রকাশ করিয়াছেন এই জন্য এখানে বিবাহ রহিত হইল। দামু ঘোষ ও পুরোহিত মহাশয় সভাস্থলে বর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; তাঁহারা অকস্মাৎ এই দুঃসংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা রমণী মোহনকে লইয়া একবার দেবীপুরে যাইয়া উমানন্দের পিতার হাতে পায়ে ধরেন এবং বলেন—মহাশয়! রক্ষা করুন, বিনাদোষে একটী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনার পুত্রের বিবাহ সহজেই হইবে কিন্তু বিনাদোষে এইরূপ একটা কলঙ্ক ঘোষিত হইলে দরিদ্রার কন্যার বিবাহ হওরা সুকঠিন, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কন্যার জননী প্রভাবতীদেবী সতী-

শিরোমণি; গঙ্গাবারি অপেক্ষাও পবিত্রা। রমণীমোহন আসিলে, একবার পায়ে ধরিতে যাইবেন, কিন্তু রমণী যে কার্য্যাভরে কোথায় গিয়াছে?

যে লোকটী সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল সে বলিল—মহাশয়! সে চেষ্টা বৃথা; কর্ত্তার পরম বন্ধু কুসুমপুরের অন্যতম জমীদার প্রমথ বাবু আসিয়া এ বিবাহে অমত করিয়া ভিন্ন স্থানে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। পাত্র লইয়া বোধ হয় এতক্ষণ তথায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। আর বৃথা পরিশ্রম করিয়া তথায় যাইয়া ফল কি? রামু ঘোষ প্রমথবাবুর নাম শুনিয়া বুঝিল—কেন এ বিড়ম্বনা!

তাহার পুত্র প্রভাসের সহিত গৌরীর বিবাহ না দিয়া অমর্য্যাদা করাই —আজ এই শত্রুতার কারণ। কিন্তু হায় প্রমথ! তুমি একি করলে? সাক্ষাৎ সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, সতীর আদর্শ প্রভাবতীর প্রতি অযথা একটা কলঙ্ক চাপাইয়া গৌরীর বিবাহ পথ এমন কণ্টাকাকীর্ণ করিলে —যাহা সহজে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে পাত্রস্থ করা হিন্দু সমাজে মহা দায় হইবে, হায়! অবলা স্ত্রী জাতির উপর এরূপ প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত করিয়া কন্যার সহিত তাহাকে দগ্ধ করা কি তোমার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইয়াছে? আজীবন পতিপ্রাণা সতীকে অসতী বলিয়া ঘোষণা করিতে তোমার প্রাণে কি আঘাত লাগিল না? স্বার্থের নিকট মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম এইরূপেই লোপ পাইয়া থাকে।

এই বিষম সংবাদ অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে বেশী বিলম্ব হইল না। প্রভাবতী অকস্মাৎ এই বিষম সংবাদ শুনিয়া সমস্ত দিনের উপবাসে দুর্ব্বল দেহে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আনন্দ কোলাহল শোক-

দুঃখের মর্ম্মভেদী হা হুতাশে পূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ণানন্দে নিরানন্দ, হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল! কমলমণি প্রাণের গৌরীর পরিণাম বুঝিয়া বুক চাপড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর ন্যায় আদর্শ সতী প্রতিমার চরিত্রে কলঙ্ক—কালিমা লেপন করিয়া কোন্ পাষণ্ড তাঁহার ননীর পুতলী কন্যার এরূপ সর্ব্বনাশ করিল? ভগবান! তুমি রাতদিনের কর্ত্তা, সে দুরাত্মার মাথায় বজ্রাঘাত ফেলিয়া দাও—বলিয়া বুড়ী কত অভিসম্পাত করিতে লাগিল; গৌরীর সঙ্গিনীগণ দুঃখে ক্ষোভে মুহ্যমানা হইল, আর গৌরী সে চিরবিশ্বাসিনী রমণী, শিব পূজায় সে প্রতিদিন সচন্দন বিল্বপত্র অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তন্ময় থাকে—সে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া মনে মনে বলিল এ বিশ্বে, বিশ্বনাথের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; যাহা আমার মঙ্গলজনক তাহাই তিনি করিবেন, কিন্তু জননী আমার স্বর্গের দেবী অপেক্ষাও পবিত্র, তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া হতভাগ্য নিজেরই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে; তাঁহার চক্ষের জল নিশ্চয় পাষণ্ডের উন্নতির কণ্টক হইবে, বলিয়া সে জননীর নিকট গমন করিল, ধীরে ধীরে পাথার বাতাস করিয়া বলিল মা-আমার স্থির হউন। তারপর জননীর মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৩

প্রথম লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন কি হইবে? এই রাত্রে গৌরীর বিবাহ দিতে না পারিলে

ত "দোপড়া" মেয়ে বলিয়া হিন্দু সমাজে তার স্থান হইবে না, কেহত তাহাকে বিবাহ করিবে না—এখন উপায় কি ?

কন্তার শুশ্রূষায় প্রভাবতীর চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছে বটে কিন্তু তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিয়া আকুল হইতেছেন। এমন সোণার প্রতিমা, মেয়ে, তাহার ভাগ্য এত মন্দ! কিন্তু হায়! তাহার অপরাধ কি ? সে যে আমার কলঙ্কে কলঙ্কিতা ; ওঃ! আজ কি পাপে আমাকে এ তাপ ভোগ করিতে হইতেছে ? যাহার শাপে আমার সোণার কমল জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে ? জগদীশ! সর্ব্বসাক্ষী ভগবান, অন্তর্যামিন্! তুমিই জান, আমি সতী কি অসতী, তুমিই জান আমি পতিতা কি পতিব্রতা ; আমার প্রাণের দেবতা আমার প্রতি বিরূপ হইলেও সে আরাধ্য মূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি হৃদয়-মন্দির হইতে বিচ্যুত করিয়াছি কি না ; তিনি আমাকে বিনা-দোষে পায়ে ঠেলিয়াছেন ; কিন্তু তিনি পায়ে ঠেলিলেও আমি চিরদিনই তন্ময় হইয়া আছি ; দুষ্ট লোকে আমাকে কত প্রকারে প্রলোভিত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ; নিরাশ্রয়া দেখিয়া আমাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য বিধিমতে পাছে লাগিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ দামুদাদার প্রবল প্রতাপে কেহ আমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই। দাদা আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত প্রাণের টানে সতত রক্ষা করিয়াছেন। দুষ্টলোক তাহাতে তাঁহাকে বদনামের ভাগী করিয়া আজ আবার আমার দুধের মেয়ের বিবাহে, স্বর্ণ লতিকার শুভ পরিণয়ে দারুণ বিড়ম্বনা উপস্থিত করিয়াছে। করুক, কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি স্বামী ভিন্ন

অন্য পুরুষের প্রতি কখন আসক্তির উদ্দীপনা আমার মনে জাগিয়া না থাকে তাহা হইলে কখনই আমার প্রাণের পুতলীর সর্ব্বনাশ সাধন হইবে না। প্রভাবতী সজল নয়নে উর্দ্ধেই চাহিয়া মনে মনে বলিলেন—দেবতা, সহায় হও, মধুসূদন বিপদে রক্ষা কর। তার পর ছলছল নয়না গৌরীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন—মা! ভয় কি, তোমার মা কলঙ্কিনী নহে, দেবতা সাক্ষী।

এদিকে পরোপকারী দামু ঘোষের মাথার বজ্রাঘাত পড়িয়াছে, সে আর কিছুতেই থাকিতে পারিতেছে না। এই শেষ লগ্ন উত্তীর্ণ হইলেই সব আশা ভরসার মূলোচ্ছেদ হইবে—গৌরী "দোপড়া" হইয়া হিন্দু সমাজের বার হইয়া যাইবে, তাহার আর বিবাহ হইবে না। দামু অপার ভাবনা সমুদ্রে ভাসিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল; প্রভাবতী ইষ্টপদে প্রাণের কাতরতা জানাইতে লাগিলেন—বুঝি দেবতা সদয় হইলেন।

এইরূপ বিপদে ভাললোক মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়া থাকে। পুরোহিত রামদয়াল ভট্টাচার্য্যও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছিলেন। —উপায় কি? সত্য সত্যই কি একটী দুর্ব্বলা অবলার জাতি নষ্ট হইবে? তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া দামুকে বলিলেন—আচ্ছা দামু! তোমারা এত চিন্তিত হইতেছ কেন? তোমার হাতের মধ্যেই ত সুন্দর সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পাত্র রহিয়াছে। তুমি একটু জেদ করিলেই বোধ হয় এই লগ্নে শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; বহু ভাগ্যের ফল না হইলে—এমন পাত্র পাওয়া যায় না।

পুরোহিত মহাশয়ের কথায় দামু যেন ভাবনা সমুদ্রে কুল পাইল। সে শশব্যস্তে বলিল—কাহাকে আপনি অনুমান করিয়াছেন প্রভু!

রামদয়াল কহিলেন—কেন তোমার বন্ধু রমণীমোহন।। সে কি সর্ব্বাংশে গৌরীর উপযুক্ত পাত্র নহে? তাহার মত সদাশিবের করে গৌরীদান করিলে যথার্থ গৌরীদানের ফল হইবে। রমণীমোহন বংশে বংশজ হইলেও গুণে অনেক মহারথী কুলীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুলীনের যাহা কিছু গুণ, তাহা রমণীমোহনেই বর্ত্তমান, আমার বিবেচনায় আর কাল বিলম্ব না করিয়া তোমরা তাহারই করে গৌরীকে সমর্পণ কর—তাহা হইলে এ মিলন রাজযোটক হইবে, গৌরী চিরসুখিনী এবং মহাসৌভাগ্যশালিনী হইবে।

দামুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে বুঝিল বাস্তবিকই ত তাই; পুরোহিত মহাশয় ত ঠিকই বলিয়াছেন—রমণীমোহনের তুল্য পাত্র আর কে আছে? তাঁহার এখনও বিবাহ হয় নাই। এই বিপদের কথা জানাইয়া অনুরোধ করিলে তিনি যেরূপ দয়াপ্রবণ-হৃদয় তাহাতে কিছুতেই এড়াইতে পারিবেন না। দেখি—ইহাতে প্রভার মত আছে কিনা? বলিয়া দামু প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—এ বিষয় আমার কিছুমাত্র অমত নাই; রমণীমোহনের সহিত গৌরীর বিবাহ হইলে গৌরীত সৌভাগ্যবতী হইবেই—আমিও নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব। তুমি তাহাকে লইয়া আইস, আমি তাহার মত জিজ্ঞাসা করি। বলিয়া হতভম্ব ভাবে এক স্থানে বসিয়া রহিলেন।

রমণীমোহন এতক্ষণ কোন কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণও বিচলিত হইয়া পড়িল, কিন্তু হতাশ না হইয়া বলিলেন—ভাই দামু! আচ্ছা চল না, আর একবার না হয়

উমানন্দের পিতার পায়ে ধরিয়া কৃপাভিক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও কি উপায় হইবে না ?

দামু বলিল—ভাই যখন কোন বদলোক প্রভার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে এখন তাহার মতি পরিবর্ত্তন করা, এবং প্রভাবতী যে নিষ্কলঙ্ক তাহার প্রমাণ করা কি দুই এক ঘণ্টার কাজ। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে লগ্ন উত্তীর্ণ হইলে হিন্দু শাস্ত্রমতে গৌরী পতিতা হইবে, তাহার আর বিবাহ হইবে না—এখন তাহার উপায় চিন্তা কর।

রমণীমোহন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—বাস্তবিক ভাবনার কথা বটে, এ রাত্রিতে পাত্র কোথায় পাওয়া যায়, আমিত ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন পাত্র মনে আনিতে পারিতেছে না ?

পুরোহিত রামদয়াল বলিলেন—দেখ রমণী এখন উপায় তুমি, যদি অভাগিনীর প্রতি দয়া কর, তবেই তাহার জাতিকুল রক্ষা হয়। গৌরী যথার্থ সৎ পাত্রে সমর্পিতা হইয়া নারী জন্ম সফল করিতে পারে, নতুবা এই সামান্য সময়ের মধ্যে আর কোন উপায় হইতে পারে না। তুমি ইহাদের জীবন রক্ষার্থে যথেষ্ট করিয়াছে; এক্ষণে জাতি কুল মান ও ধর্ম্ম রক্ষার্থে এইটুকু ত্যাগ স্বীকার কর। তাহা না হইলে প্রভাবতী রজনী প্রভাতেই লোক লজ্জায় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

দামু ছল ছল নয়নে পুরোহিত মহাশয়ের মুখের প্রতি আগ্রহে চাহিয়াছিল—রমণী কি এ প্রস্তাবে হঠাৎ রাজী হইবে ? রামদয়াল ভট্টাচার্য্যের কথা শেষ হইলে দামু নিরতিশয় কাতর ভাবে বলিল—রমণী ভাই এইবার তোমার উদার হৃদয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, যথার্থ শিক্ষার প্রভাব যে কত উচ্চ তাহার পরিচয় দাও।

রমনীমোহন আসিয়াছেন শুনিয়া প্রভাবতী আর থাকিতে পারিলেন না। তাহাকে ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বাবা এখন তোমাকে না বলিলে আর উপায় কি? তোমার মত পরদুঃখকাতর নির্ভীক যুবক না হইলে এ বিপদে আর কে উদ্ধার করিবে? তোমার গুণের কথা আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি, নিজেও উপভোগ করিয়াছি। এক্ষণে মাসীমার মুখে তোমার বংশাবলীর কথা শুনিয়া এ বিপদে তোমাকেই কাণ্ডারী স্থির করিয়াছি আজ রাত্রে যদি গৌরীর বিবাহ না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জেনো আমি প্রাতঃকালে সমাজে আর এমুখ দেখাইব না।

কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাহার সমস্ত দিন অনাহার বিশুষ্ক বদনের প্রতি চাহিয়া—আর একটা বিষম কলঙ্ক মোচনের জন্য যাহাতে সেই রাত্রে গৌরীকে পাত্রস্থ করিতে, পারেন তাহার জন্য তিনি মৌলিকেও কন্যা দান করিতে সম্মত হইতেছেন বটে; কিন্তু আবার ভাবিতেছেন কন্যা কার? কাহার আদেশে আমি এত বড় একটা অন্যায় কাজ করিতে অগ্রসর হইতেছি যাহার কন্যা তিনি যে এখনও জীবিত! জাতি যে তাঁহার! যাইলে যে তাঁহার যাইবে? আমি তাঁহার আজ্ঞাকারিণী, দাসী হইয়া তাঁহার অনুমতি না লইয়া এত বড় একটা মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ফেলিব? আবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন—আজকার রজনী প্রভাত হইলে গৌরী যে হিন্দু সমাজে রহিতা হইবে, দোপড়া হইলে যে তাহার বিবাহ হইবে না! জগদীশ, আমি কোন দিক রাখি, হায়! প্রাণের দেবতা, তুমি এ সঙ্কট সময়ে কোথায় রহিলে, দাসীকে দেখ আর নাই দেখ, পদতলে স্থান দাও আর নাই দাও, প্রাণের কন্যার এ

সঙ্কট সময়ে এক বার দেখা দাও, অবলা বুদ্ধিহীনা নারী আমি, কি করিব—কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভাবতী কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—অথচ রমনীমোহনের লোভও সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত রমণীমোহন—অমন সোনার চাঁদ ছেলে আর মিলিবে না।

সকলেরই ইচ্ছা বিশেষতঃ প্রভাবতীর সোদর প্রতিম দামু ঘোষ নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছেন—যাহাতে প্রাণের বন্ধু রমনী মোহনের সহিত গৌরীর মিলন সংঘটিত হয়। আর বেশী সময় নাই—লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া দামু বলিল—রমনী! ভাই! আর বিলম্ব করিও না, দরিদ্রার পাণিগ্রহণে আর অন্যমত কবিও না; আজিকার এই শেষ লগ্ন ভ্রষ্ট হইলে অভাগিনী গৌরীর যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ত বুঝিতেছ—তাই পরোপকারসাধনে তুমি আর কেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ?

রমণী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—তাইত দামুভায়া! এ যে বিষম সমস্যা; আমার জননীকে কিছু জানান হইল না; শুনিতেছি কন্যার পিতা জীবিত আছেন, তিনিও কোন প্রকার অনুমতি দিলেন না, আর আমি হঠাৎ কয়েকজন স্ত্রীলোকের কথায় এমন একটা মহৎ কার্য্য সমাধা করিব! ইহাতে কন্যার পিতৃকুলকে কি পতিত করা হইবে না?

পুরোহিত রামদয়াল ঠাকুর বলিলেন তাহাতে তোমার কোন প্রকার পাপ স্পর্শ হইবে না, উহার পিতা ত জন্মাবধি কোন প্রকার ভার গ্রহণ করেন নাই; কন্যা যখন হইয়াছে তখন তিনি এ বিষয় চেষ্টা করেন নাই কেন? এখন জননীর যেরূপ ক্ষমতা সে সেইরূপ আচরণই

করিবেন। তুমি বিবাহ করিলে ইহাদের একটা প্রকৃত অভিভাবক হয়, আমি তোমার উপর এই দুঃস্থ পরিবারটীর পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

রমণীমোহন এতক্ষণ মনে মনে গৌরীর পাণিগ্রহণ কর্ত্তব্য এবং প্রভাবতীকে এই দায় হইতে উদ্ধার না করিলে জাতিপাত হইবে জানিয়া কতকটা নিমরাজী হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে পুরোহিতের কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তাঁহাকে এইস্থানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহাদের যাবতীয় দায়িত্ব লইয়া অভিভাবক রূপে গৃহ-জামাতা হইতে হইবে, শুনিয়া আর ঘাড় পাতিলেন না। তাঁহার নিজেরই এখন কিছুই স্থিরতা .নাই; দেশে জননীর কষ্টের একশেষ, তাহার উপর এই তিন চারিটী প্রাণীর দায়িত্ব লইয়া কলিকাতায় শ্বশুর বাটীর ঘর-জামাই হইয়া থাকিতে হইবে—ইহা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে—বলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে বিবাহের শেষ লগ্নটী সমুপস্থিত হইল। সকলেই প্রভাবতীকে বলিতে লাগিল—এমন শুভ সংযোগ কখন হইবে না, তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিও না, রমণী মোহনের মত সাধু প্রকৃতির যুবক আর পাওয়া যাইবে না, একবার ভাল করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ কর, তোমার অনুরোধ সে কখনই উপেক্ষা করিতে পরিবে না?

গৌরীর প্রাণ মায়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া ছিল। নারীজীবনে স্বামীর সুখই সুখ, হিন্দু রমণীর যত কষ্টই হউক, যতক্ষতিই স্বীকার করিতে হউক, এ সুখে বঞ্চিতা হইতে তাঁহারা কখনই রাজী নহেন। এখানে জাতি বিচার নাই, ছোটবড় বুঝিবার সামর্থ্য এখানে

থাকিতে পারে না; মন গুণের পক্ষপাতী হইলে, নয়ন রূপে মুগ্ধ হইলে সামান্য একটু বাহ্যিক বিচার লইয়া টানাটানি কি চলে? রমণীর যে গুণ, যে রূপ এবং তিনি যেরূপ ধর্ম্মে আস্থাবান তাহাতে অনেক জাতি-শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার পায়ের তলায় দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না; তবে গৌরী তাহার পক্ষপাতী হইবে না কেন? তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে, প্রাণের দেবতারূপে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে কেন ভিন্ন মত করিবে? তাই যথন রমণীমোহনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে—একথা জনে জনে প্রচার করিল, তথন তাহার হৃদয় উল্লাসে উৎফুল্ল হইল,দেবতা সন্নিধানে এই আনন্দের স্থায়ীত্ব প্রার্থনা করিয়া শুভ সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

১৪

শাস্ত্র যথন বলিতেছেন—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" তথন গৌরীর মত মহদ্বংশ সম্ভূতা রমণীকে অঙ্কলক্ষ্মী করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। গৌরী সুশিক্ষিতও সুন্দরী। শুধু তাহা নহে—কর্ম্মকুশলা, প্রভাবতীর ন্যায় আদর্শ-গৃহিণীর হাতে-গড়া, মানুষ করা গৌরী যে সংসার কার্য্যে পাকা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরীর রূপ অতুলনীয়, গুণও অসীম, তাহার উপর এই অল্প বয়সে সে হিন্দুর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের গৃহকর্ম্ম বেশ সুন্দর ভাবে চালাইতে শিখিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সেই ঠাকুর ঘরের পূজার উদ্যোগ হইতে রন্ধন কার্য্য এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবা শুশ্রূষা পর্য্যন্ত

এমন সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারে, যাহা আধুনিক শিক্ষিতা রমণীগণ দেখিলে অবাক হইয়া থাকিবে। শুধু কি তাই, গৃহ-শিল্পও গৌরীর সমস্ত জানা ছিল, চরকা কাটা, পৈতা তোলাও সূচীকার্য্যে, সে বেশ অভ্যস্তা হইয়াছে। এহেন গুণবতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে রমণীমোহনের ইচ্ছা হইয়াছে। যদি বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হয়, তাহা হইলে এই পবিত্র বংশের স্ত্রীরত্নই সংসারের সঙ্গিনী করা উচিত। কিন্তু ঐ পুরোহিত মহাশয়ের একমাত্র কথায় সে একটু পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল। তার পর প্রভাবতী মুখ ফুটিয়া আর কিছু বলিতেছেন না, তাহার পিতাও উপস্থিত নাই, এরূপ অবস্থায় বিবাহ কেমন করিয়া হইবে? রমণীর মাতা ত পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অনবরত পিড়াপিড়ী করিতেছেন। এক্ষণে নিজে কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে জননীর বিরাগভাজন হইবে না তাহার সে বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় আছে। কিন্তু কন্যার জননী, আগ্রহ বা তাহার পিতার অনুপস্থিতি বুঝিয়া সে আর কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া বাহিরে আসিল।

প্রভাবতীর মাসী সোণামণি বলিল—প্রভা! এমন সুযোগ ছাড়িস্ নে, তাহা হইলে আর উপায় নাই। প্রভাবতী কিন্তু বিষম ভাবনায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। লগ্ন বুঝি উত্তীর্ণ হইয়া যায়! গৌরী বুঝি চিরতরে দুর্ভাগ্যের অতলে ডুবিয়া পড়ে; সকলেই হৈ হৈ করিতেছে, বলিতেছে—প্রভাবতী এমন আহাম্মুক মেয়ে মানুষ কেন, মঙ্গল ঘট পা দিয়া ভাঙ্গিতেছে কেন? কিন্তু অপরে ত জানে না যে তিনি কিরূপ সমস্যায়

পা দিয়াছেন, কিরূপ দুশ্চিন্তায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন? স্বামী যে তাহার জীবিত, কন্যার এ বিবাহে শুধু তিনি মত দিয়া কেমন করিয়া জাতিকুল নষ্ট করিবেন, হিন্দুস্ত্রী কি এমন প্রগল্‌ভা, এমন স্বাধীনা হইতে পারে? কিন্তু সময় ত আর নাই, প্রতিবাসী সকলেই উতলা হইয়া কলরব করিতেছে, বিবাহ হইল না বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে; নিমন্ত্রিতগণ বিবাহ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। রমণীমোহনও বিশ্রাম করিবার আশায় বাসায় যাইবার জন্য বহির্দ্বারে পা বাড়াইয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ এক ভৈরব মূর্ত্তি দরজার দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—প্রভা! সতী সিমন্তিনী, এই যে আমি আসিয়াছি; গৌরীর বিবাহে আর বাধা কিসের? আমি সমস্তই শুনিয়াছি, রমণীমোহনের মত গুণবান্ পবিত্র বরে কন্যা সম্প্রদানে ভয় নাই, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তোমার কুলাঙ্গার স্বামী এতাবৎকাল তোমার মত সতীর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহার জন্য সে সতত সন্তপ্ত! সতী! আমার কুলীনের গরিমা দূর হইয়াছে, আমি যে এত দিন কেবল বংশগত কুলের অহঙ্কারে গর্ব্বিত ছিলাম, সেদিন প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় মহাপুরুষের উপদেশে আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে; আমি বুঝিয়াছি—গুণহীন হইলে কখন কুলীন হওয়া যায় না; আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা বৃত্তি তপ ও দান এই নবধা গুণে গুণবান না হইয়া যে আপনাকে কুলীন বলিয়া পরিচয় দেয় সে মহাপাপী; তুমি যে পাত্র স্থির করিয়াছ সে আমাপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল কুলীন, তুমি তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান কর।

স্বামীর কণ্ঠস্বর বহুদিন পরে শুনিলেও স্ত্রীর নিকট তাহা অপরিচিত থাকে না। মূর্ত্তি হাজার পরিবর্ত্তিত হইলেও পতিব্রতা পত্নী দর্শন মাত্রেই তাঁহাকে চিনিতে পারে। যাহা হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পাষাণ দাগের মত নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত, তাহা কি কয়েক বৎসরের অদর্শণে মুছিয়া যাইতে পারে? প্রাণ কি সে প্রাণ ভরা ভালবাসা মাখান মূর্ত্তি ভুলিয়া যাইতে পারে? কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রভাবতী আলুলায়িত কুন্তলে দৌড়িয়া আসিলেন এবং সেই জটাজূট সমন্বিত গেরুয়া বসনাবৃত মূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদতলে আছড়িয়া পড়িলেন, নয়নের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—প্রভু! দাসী আজ তোমার বিহনে কলঙ্কিনী নামে অভিহিতা হইয়াছে; তাহার কন্যাও কুলকলঙ্কিনীর কন্যা বলিয়া কেহ বিবাহ করিতেছে না। গৌরী দোপড়া হয়, তাহার ভবিষ্যৎ কুয়াসাচ্ছন্ন হয় দেখিয়া এই স্বভাব সুন্দর সুশ্রী সর্ব্বগুণসম্পন্ন রমণী-মোহনকে কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম কিন্তু আমিত স্বাধীনা নই? তুমি থাকিতে কন্যার বিবাহে মত দিবার ক্ষমতা আমার কোথায়? পাছে জাতি নাশ হয়—এই ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এখন কর্ত্তা আপনি আসিয়াছেন, কার্য্য আপনার, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন। এই বলিয়া নির্য্যাতিতা, উৎপীড়িতা, কটুভাষণভাষিতা প্রভাবতী স্বামীর শুভাগমনে আনন্দিতা হইয়া তদীয় পদধূলি গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্বকার কটূক্তির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

শুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া যায়, লগ্ন বহির্ভূত হয়, এখন আর আস্ কথা পাশ্ কথা লইয়া সময় কাটাইলে চলিবে না, কাজেই অনাথনাথ অন্য কথা না তুলিয়া রমণীমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৎস

রমণীমোহন ! আমি এত দিন কৌলিন্যের বড়াই গরিমা করিতাম কিন্তু সে ভ্রম আমার ঘুচিয়াছে। কৌলিন্য বংশগত নহে, গুণ গত, যাহার নবধা গুণ আছে ; বল্লাল—প্রোক্ত নয়টী পবিত্র গুণে যে গুণবান—সেই যথার্থ কুলীন নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। আমরা গুণহীন মিছা কুলের গৌরব করিয়া সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিলাম, এক্ষণে মহাপুরুষের কৃপায় আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে ; তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অবধি জাতির বড়াই ছাড়িয়া দিয়াছি। তুমি বংশ মর্য্যাদায় মৌলিক হইলেও গুণ গরিমায় কুলীনের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পার, আমি তোমার জননী সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে বিশেষ রূপে জানি, তিনি তোমার মত পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া রত্নগর্ভা হইয়াছেন। এক্ষণে আমি অকপট হৃদয়ে তোমার মত গুণময় পাত্রে আমার একমাত্র কন্যা গৌরীকে সম্প্রদান করিতে বাসনা করি—বৎস ! তুমি সরল প্রাণে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর।

এইবার দামুঘোষ ও সোণামনি অনাথ নাথকে চিনিতে পারিল ; এই শুভ সময়ে ভগবানের কৃপায় সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আর বিবাহে কোনও প্রকার গোলযোগ হইবে না। গৌরী ও মনোমত পাত্রে সমর্পিতা হইয়া জীবন ধন্য করিবে, তাহার এত দিনের পোষিত মনোবাসনা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া সকলেই আনন্দিত হইল ! অনাথের প্রতি দামুঘোষের যে জাত-ক্রোধ ছিল. একবার সম্মুখে পাইলে তাহার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এক্ষণে সে ক্রোধ চাপিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনাথনাথ তথাপি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দামু ! আমি তোমাদের সকলের

নিকট অপরাধী, তবে তুমি যাহা করিয়াছ শুনিলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সময় নয়; আগে গৌরীর বিবাহ হইয়া যাক্ তার পর তোমার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব। বলিয়া তিনি পুনরায় রমণী মোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রমণী! সরল প্রাণে অনুমতি দাও, কন্যা তোমার করে সম্প্রদান করি; তুমি বোধ হয় একটা বিষয়ে ভয় পাইয়া কথা কহিতেছ না কিন্তু যখন আমি আসিয়াছি, তখন আর তোমার সে চিন্তা নাই। তুমি স্বাধীনচেতা যুবক, মনে করিয়াছ—এ বিবাহ করিলে তোমাকে ইহাদের অভিবাবক রূপে গৃহ-জামাতা হইয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু আমার উপস্থিতিতে আর তোমার সে ভাবনা কি বৎস! আমি কাহারও স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে চাহিনা; গৃহ-জামাতার মত হেয় হইতে আমি কাহাকে পরামর্শও দিই না। আমি কুলীন হইয়াও কখন কাহার গৃহ-জামাতা হই নাই। জামাতা পূজনীয় দেবতার মত, যত দিন তাহারা পূজা করিয়া রাখিত, তত দিন আমি তাহাদের নিকট থাকিতাম, তাহার পর চলিয়া যাইতাম। আমি চিরদিনই এইরূপ দাম্ভিক প্রকৃতির লোক; তার পর আমার কন্যাও সে রূপ অপদার্থ, পোষা ঘরজামাইয়ের সহিত সহবাসে কখন সুখী হইতে চাহে না, গৃহ প্রবেশের সময় আমি তাহার সঙ্গিনীদের সহিত তাহাকে এই কথা কহিতে শুনিয়াছি। সে চায় স্বামী; সে স্ত্রীর অন্নদাস চায় না; গৌরী হরের মত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পতি চায়; সে বলিতেছিল—যে স্বামী স্ত্রীর অধীন, তাহাকে স্বামী বলা একেবারেই উচিত নয়—স্ত্রৈণ্য পুরুষ চিরদিনই হেয়—। গৌরী স্বামীর মত স্বামী চায়, ত্রাতা, ভর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, দোষে শাসন কর্ত্তা, গুণে

পুরস্কার দাতা প্রভু চায়! স্বামী হইয়া স্ত্রীর পাছে পাছে আজ্ঞাবহ দাসের মত যাইবে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি মুখ পানে চাহিবে, স্ত্রী কখন কি বলিবে—তাহার অপেক্ষায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে, গৌরী তাহাকে স্বামী বলে মান্য কর্ত্তে চায় না। গৌরী আমার সাধ্বী প্রভাবতীর হাতে-গড়া মেয়ে, প্রকৃতির প্রকৃত ভাবে অনুপ্রাণিত, সে তোমার মত হৃদয়বান স্বামীই পছন্দ করে, বৎস! তুমি তাহাকে কখন উপেক্ষা করিও না।

রমণীমোহন গৌরীর প্রকৃতি জানিতেন,তাহার স্বভাব—তাহার মনের ভাবও কতক কতক বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে অনাথের নিকট তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি কতক কতক জানি, তবে কি জানেন—আমি অতি দীন হীন দরিদ্র, কপর্দ্দকশূণ্য, অবস্থায় কি আমার বিবাহ করা ভাল দেখায়? অনাথ বলিলেন—বৎস! দরিদ্রতা পাপ নহে; তাহাকে আমি গুণহীনতা বলি না। যে দরিদ্র হইয়া কখন দরিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করে নাই—জীবনে সে কখনও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে না। চির-দরিদ্র ব্যক্তিগণ অদৃষ্টের সহিত লড়াই করিয়া জগতে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়া গিয়াছে। যেখানে যত কৃতী পুরুষ দেখ, সকলেই দরিদ্রতার ভীষণ অগ্নিতে পোড়-খাইয়া তবে খাঁটী হইয়াছে। মহাভারতে দেখ—দীন দরিদ্র, রাজ্য ভ্রষ্ট পাণ্ডবগণ দুঃখের ভীষণ তাড়নায় সন্তাড়িত হইয়া, তাহার সহিত জীবন—সংগ্রামে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া বনে বেড়াইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই—তাঁহারা এত প্রখ্যাতিসম্পন্ন পাণ্ডব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, আর রামায়ণে—দশরথ পুত্র রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য জটা-বল্কলধারী হইয়া দণ্ডকবনে একরূপ অনশনে দুঃখের সহিত সমর সজ্জা।

করিয়া কাল কাটাইতে পারিয়াছিলেন—তখন হইতেই তিনি পৃথিবীর কাছে দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন—নতুবা অযোধ্যার রামচন্দ্রকে অথবা হস্তিনার পাণ্ডবদের কে চিনিত? বৎস! শিক্ষিত তুমি কি জান না যে দরিদ্রতা ও প্রতিভা, হীনতা ও মহত্ব চিরকাল সমসূত্রে আবদ্ধ! এই দেশেই না দক্ষরাজ কন্যা মা দাক্ষায়নী দীনাতিদীন শ্মশানবাসী শঙ্করকে বিবাহ করিয়া সতী শিরোমণি হইয়াছিলেন, এই দেশেই না রাজার নন্দিনী সাবিত্রী রাজ্যভ্রষ্ট, অর্থহীন বনবাসী সত্যবানকে স্ব ইচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছিলেন? এই দেশে কি জনকনন্দিনী রাজবধূ সতীপ্রতিমা সীতাদেবী বল্কল পরিধারী স্বামীর সহিত বনে বনে ঘুরিয়া আরাধ্যতমা হন নাই; তবে আমার মেয়ে সেই দেশে, সেই সীতা সাবিত্রীর মত জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখের সহিত লড়াই করিতে পারিবে না কেন? সে ত আর রাজার মেয়ে নয়—আমার মত গরীবের মেয়ে, যদি একান্তই অদৃষ্টে সুখ না থাকে, দুঃখই ভোগ করবে তাতে আর হয়েছে কি? বৎস! সুখ দুঃখ ভোগ মানবের পূর্বজন্মের সুকৃতি দুকৃতির অজানিত ফল; তবে শিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকিয়া কার্য্য করিলে বড় লোক হইতে না পারুক, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট কখনও পায় না—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। এই জন্য সুস্থ-স্বাস্থ্য, আচারবান হিন্দু বিবাহ করিয়া আশ্রয়স্থল গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে সে নিশ্চয়ই আশ্রম উজ্জল এবং সকলের হইয়া থাকে।

অনাথনাথের উপদেশ পূর্ণ সুমধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রমণী মোহন বিবাহে আর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। একবার মনে

করিলেন দেশে জননীর অনুমতি লওয়া হইল না—কিন্তু তিনি ত বহুবার এ বিষয় অনুরোধ করিয়াছেন—তুমি মনোমত ভদ্রবংশের একটী সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ কর, নতুবা আমি ক্রমশঃ অশক্ত হইয়া পড়িতেছি কবে মরিয়া যাইব আমার বধূর মুখ দেখার সাধ মিটিবে না? গৌরী ত তাঁহারই মনোমত বধূ হইবে আর অনাথবাবু ত বলিতেছেন আমার জননীর সহিত তাঁহার খুব পরিচয়, তবে আর কেন? রমণীমোহন সরল প্রাণে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঘোর নিনাদে মাঙ্গলিক শঙ্খ আবার গগনভেদ করিয়া আরাবিত হইল।

প্রভাবতী মনের আনন্দে প্রাণের জামাতাকে বরণ করিলেন। গৌরী এত দিন যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শিব পূজা করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল; পিতাও আসিয়া তাঁহার কলঙ্কের পশরা দূরে ফেলিয়া তাঁহাদের সুখের ভাগ গ্রহণ করিলেন দেখিয়া দেবতার পদে আন্তরিক পূজা প্রদান করিল। সঙ্গিনীগণ বরকে পরিবেষ্টন করিয়া পরমানন্দে হুলাহুলি দিতে লাগিল।

রামদয়াল ঠাকুর বলিলেন—আর বিলম্ব করিও না, সত্বর স্ত্রী—আচার সারিয়া লও, নতুবা লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহার কথায় সকলে সত্বর হইল! বরাসনে বর উপবেশন করিলেন, অনাথনাথ সম্প্রদানের জন্য আসনোপবিষ্ট হইয়া কন্যা উৎসর্গ করিলেন। সকলে এ হরগৌরী সম্মিলন দেখিয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তবে গৌরীর সঙ্গিনীগণের আশা ভালরূপ মিটিল না, কারণ রজনী শেষে লগ্ন, বিবাহের পর আহারাদি করিতেই রজনী শেষ হইল বাসরের আসরটা আর ভালরূপ জমকাইল না। রজনী প্রভাতেই বরকন্যা বিদায়ের পালা;

রমনী প্রভাতেই একাকী বিদেশ যাত্রা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন. তাহা আর হইল না, স্ত্রীরত্ন হইয়া জননীর সেবায় নিযুক্ত করিতে দেশে চলিলেন। প্রভাবতীর এতদিনের উৎকণ্ঠা, এতদিনের ভাবনা আজ তিরোহিত হইল। দারুণ বিষাদের পর কন্যার বিবাহ দিয়া—এবং হারাণ স্বামীর পদতলে আশ্রয় লাভ করিয়া কলঙ্কিনী নাম স্খালন করিলেন, সকলের মুখে চুণকালি দিয়া স্বামী সোহাগে নারীজন্ম সফল করিতে লাগিলেন।

১৫

রুদ্রপুরের সকলেই মনে করিয়াছিল—রমণীমোহন অতিরিক্ত ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে, সকল পরীক্ষাই সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবার সে একটা হাকিম হইবে, আর বোধ হয় দেশে থাকিবে না; কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া কোন বড় ঘরে বিবাহ করিবে কিন্তু তাহা হইল না, তিনি একটী দুঃস্থ ভদ্রঘরের মনোরমা ভার্য্যা লইয়া পুনরায় পল্লী জননীর নিভৃত আরামপ্রদ বাসভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

জননী সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে কত বুঝাইয়া সুঝাইয়াও বিবাহে রাজী করাইতে পারেন নাই। আজ তাঁহাকে স্বইচ্ছায় একটী সুন্দরী বধূ লইয়া ঘরে আসিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ যে কতদূর আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তাহা বলিতে পারা যায় না। সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর প্রদত্ত সমস্ত বিষয় আশয় নষ্ট

করিয়া পুত্রকে পণ্ডিত করিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন শেষদশায় পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া, উপায়ক্ষম হইয়া, সুন্দরী পত্নী লইয়া, তাঁহাকে সুখী করিবে। এক্ষণে পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া তাঁহার আশার অর্দ্ধেক ফল হইল, সে মুখে যেন নম্রতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, ভালবাসা মাখান রহিয়াছে, বধূর রূপ যেমনি, গুণও যে তদ্রূপ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই কারণ ভগবদ্দত্ত রূপ গুণের অনেকটা অনুসরণ করিয়া থাকে। আর পুত্র যখন এত দিন পরে নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়াছে, তখন আর তাহার সন্দেহের কোন কারণ নাই ; রমণীত আর যে সে ছেলে নয়।

পাড়ার সকলে বধূ দেখিয়া একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়া বলিল,—হাঁ, রমণী যে এতদিন বিয়ে কর্ত্তে চায় নাই তা তার পছন্দ আছে বটে ; বউটী শতেকের মধ্যে একটী, যেন চাঁপা ফুলটী ; আহা ! রমণীর মার বহু কষ্টের বউটী, ব্যাটার সহিত হাড়ান্তি গোড়ান্তি হয়ে বেঁচে থাক্ ! সিদ্ধেশ্বরী গৌরীকে বুকে করিয়া স্বর্গগত স্বামীর উদ্দেশে দুই এক ফোঁটা শোকের অশ্রু ফেলিয়া তাহাদের বলিলেন—হায় ! মা, যাঁর এত সাধের রমণী, তিনিত আর নাই, এখন তোমরা আমার রমনীকে ও বৌমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা আমার অন্নপূর্ণার মত সংসার পেতে পাকা চুলে সিন্দূর পরে। পাড়ার সকলে মৌখিকত বেশ আশীর্ব্বাদ করিল, কিন্তু আন্তরিক কে কি করিল, তাহাত বলিতে পারা যায় না। এক একটা স্ত্রীলোকের মন যে বিষে ভরা, যদি তাদের এমনটী না হয়ে থাকে, তাহা হইলে কি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারে ?

বউ ভাল হইয়াছে দেখিয়া রমণীর মা সিদ্ধেশ্বরী আপনার সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহাতে বধূর পাকস্পর্শ কার্য্য খুব ঘটা করিয়া সমাধা

করিলেন। বৈবাহিক বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বৈবাহিক ও দামু ঘোষ আসিয়া দর্শন দিলেন, সিদ্ধেশ্বরী বৈবাহিককে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত চিত্তে বলিলেন—অ্যাঁ। বউমা আমাদের অনাথের মেয়ে—অনাথ যে আমাদের ও পাড়ার গাঙ্গুলীদের জামাই, আহা! গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেয়ে তরঙ্গিণী বেঁচে থাক্‌তে সে কতবার আমাদের বাটী এসেছে; কুলীনে করা বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কতবার আমার বাড়ীতে ভাত খেয়েছে; বউমা, আমার তাঁরই মেয়ে!

অনাথনাথ বলিলেন—হাঁ দিদি! এখন বেহান হলেন—মেয়েটাকে আমার পায়ে রাখবেন, আমি বুদ্ধিদোষে বহুদিন হলো অমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে আর এমন সরলা মেয়েকে ভুলে রাক্ষসীদের মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন। হাঁ বেহাই! যে বেহানের গুণের কথা তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে গল্প কর্ত্তে; বউমা কি তাঁরই মেয়ে?

অনাথ। হাঁ বেহান! গৌরী আমার তাঁরই মেয়ে, আর ত কোনও স্ত্রীর পুত্রাদি হয় নাই!

সিদ্ধেশ্বরী। এখন, বেহান ব্যতীত আর কি কোন স্ত্রী বেঁচে আছেন?

অনাথ। না বেহান! আর কেউ বেঁচে নাই—আমি ও বেঁচেছি; সমস্ত বৎসর শ্বশুরবাটী ঘুরিলেই এক প্রকার দিন বেশ কেটে যেতো বটে কিন্তু অনবরত টানা পড়েন কর্ত্তে—নাকে দম ছুট্‌তো; অমন সুখে আর কাজ নাই—ভাই। যেন কুলীনের গৌরব করে আর কেহ এত গুলো বিবাহ না করে, এতে ধর্ম্ম হয় না!, বরং অধর্ম্মের প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়; একটা মানুষ আর কয়টার মন যোগাইতে পারে?

সিদ্ধেশ্বরী হাসিতে হাসিতে তামাসা করিয়া বলিলেন—এ বেহানের ও তবে মন যোগাইতে পার নাই—তোমাকে সে ভুলে গেছলো ; ?

অনাথ।—সে সম্বন্ধে আমি আর বেশী কিছু সাক্ষ্য দিব না, আপনার পুত্র আমার এ স্ত্রীকে খুব জানেন, শুধু তাকে নয় তার বাপকে পর্য্যন্ত, তারপর এই একজন ভদ্রলোকের ছেলে যার অসীম দয়ায় গৌরী ও গৌরীর মার গায়ে দুঃখের আঁচ পর্য্যন্ত লাগ্‌তে পায় নাই, তাকে জিজ্ঞাসা কর, বলিয়া অনাথ ধর্ম্মপ্রাণ দামুঘোষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ঊর্দ্ধে থুতু ফেলিলে আপনার গায়েই পড়ে বুঝিয়া অপ্রতিভ হৃদয়ে দুই একবার ঢোক গিলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—না বেহাই ! বহুদিনের পর একটা ঠাট্টা করিতে হয় তাই করে নিলাম ; মেয়ের দ্বারাই যখন মায়ের সমস্ত গুণ প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তোমার কাছে সে কথা শুন্‌বার প্রত্যাশা করা বৃথা ; রমণীর মুখেও আমি ইতিপূর্ব্বে করুণাময়ের ধর্ম্মপ্রাণতার বিষয় শুনিয়াছি, তিনি না থাকিলে রমণী আমার সুস্থদেহে এতদিন কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে পারিত না। তাঁহার গুণের কথা আমরা এ জীবনে ভুলিব না ; পুণ্যাত্মা তিনি স্বর্গে গেছেন—নারকী আমরা মর্ত্ত্যে রয়েছি—তাঁর মেয়ে যে, তার কি আবার গুণের সীমা আছে !

রুদ্রপুর অনাথনাথের পরিচিত পল্লী এখানে আসিয়া তিনি প্রতিদিন বন্ধু বান্ধবের দ্বারা আহূত হইতে লাগিলেন ; খ্যাতি প্রতিপত্তি তাঁহার বাড়িয়া উঠিল, কারণ রমণীমোহন এখন তাঁহার জামাতা হইয়াছে, সে আজ বই কাল একটা বড় সরকারী চাকুরী করিবে ; এখন অনাথকে হাতে রাখিতে পারিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। অনাথের অসম্ভব পরিবর্ত্তন দেখিয়াও তাহারা অবাক হইয়াছে, যে অনাথ অহরহঃ

গঞ্জিকা সেবনে চক্ষুরক্তবর্ণ করিয়া থাকিত, সে আজ সমস্ত ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়াছে, শুধু কি তাই, যেরূপ কথাবার্ত্তা কয়. যেরূপ গভীর ভাবযুক্ত উপদেশ দেয়, তাহা অনেক সাধনভজনশীল সাধুতে ও পারে না, এবিষয় কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গুরু কৃপাহি কেবলম্" গুরুর কৃপাই আমার এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ। এখানকার পত্নীই সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক ছিল এবং ইঁহারাই আমাকে খুব যত্নে রাখিতেন কিন্তু পত্নী মারা যাইবার পর যখন ইঁহারা আমার দুর্গতি করিয়া গৃহে ঢুকিতে দিলেন না, সেই সময় আমার মন উদাস হইয়া প্রাণে কিরূপ একটা ধিক্কার আসিল। দেবীপুরে আর এক শ্বশুর বাটী গমন করিলাম, সেখানে এই দামুঘোষের তিরস্কারে আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি উদাস প্রাণে বিবাগী হইয়া কোন লোকের সঙ্গে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গমন করিলাম। তথায় আমার সৌভাগ্য ফিরিল, মহামহিম গুরুদেব দেবানন্দ স্বামীর কৃপায় আমার কৌলিন্যের গরিমা তিরোহিত হইল—তিনি দয়া করিয়া আমাকে পদতলে স্থান দিলেন, জীবের পরকাল নিস্তার মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিবা মাত্র আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম, তারপর তাঁহার সেই অমিয় মধুর, হৃদয়দ্রবকারী, মনেপ্রাণে গাঁথিয়া দেওয়া উপদেশাবলী শুনিতে শুনিতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল, তারপর যোগ শিক্ষায় আমার দেহের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ত দেখিতে পাইতেছ। ভাই! উদ্দাম প্রকৃতি লইয়া কেবল পথহারা পথিকের মত, দিশহারা কুরঙ্গের মত, ভ্রষ্টাচারী মানবের মত উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে, এমন দুর্লভ মানব জীবন কেবল নষ্ট করা হয় মাত্র। মানব জীবনইত জন্মের সার, হেলায় হারাইলে পরে পশুত্ব প্রাপ্তি ত অনিবার্য্য, তবে এ দুর্লভ

জীবন পাইয়া পশুত্বের দিকে অধোগমন করি কেন? ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, মতি ফিরাইয়া দিয়াছেন—আর মজিব না, কাহাকেও মজাইব না, কুলীন কুলীন বলিয়া আর কাহারও সর্ব্বনাশ করিব না। কৌলিন্য ভগবানের দেওয়া নয়; তিনি গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে জাতিই সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা তাঁহারই দেওয়া বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি জাতি বাঁধাবাঁধিরূপে এই চারিযুগ চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কৌলিন্য ত সে দিনকার, অনাচারী ব্রাহ্মণকে আচারবান করিবার জন্য সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন সে দিন হইা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, যাহারা আচার সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, সুশিক্ষায় যাহাদের চরিত্র মার্জ্জিত হইয়াছে, সেইত কুলীন। নতুবা গুণহীন হইয়া কুলীন বলিয়া গর্ব্ব করায় মহাপাপ! কতকগুলা বিবাহ করিয়া সমাজে পাপের বৃদ্ধি করাই, এই সকল কুলীনের উদ্দেশ্য। একজনের স্বামী হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা যাহার নাই, তাহার বহু স্ত্রীর স্বামী হইতে যাওয়া আর সমাজকে নরকার্ণবে ডুবাইয়া দেওয়া একই কথা! সতী স্ত্রীর হাহুতাশে এই জন্য হিন্দুসংসার এইরূপ জাহন্নমে যাইতে বসিয়াছে। আর না; যাহা করিয়াছি, তাহার উপায় নাই. এক্ষণে এই কর্ম্মক্ষেত্রে দেখি যদি সতী স্ত্রীর সাহায্যে কর্ম্মের বন্ধনে থাকিয়া ধর্ম্মের বন্ধনে নিজেকে ভাল রূপে বাঁধিতে পারি এ জগতে কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরুদেব—উপদেশ দিয়াছেন কর্ম্মই যোগ, যোগযুক্ত হইয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে কর্ম্মেই জীবের মুক্তি হইতে পারে। বিনা কর্ম্মে জীবের মুক্তি নাই। এই কর্ম্ম সকামভাবে করিতে করিতে নিস্কাম হইলেই মুক্তিলাভ নিঃসংশয়। জয়

অনাথবাবুর গৃহ-প্রবেশ কালে প্রভাবতী মাথার কাপড় টানিয়া দে চুল বাঁধিতে বসিলেন। অনাথ এমন স্বর্ণপ্রতিমা কন্যার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। সে চায় টাকা, না হয় একখানা গহনা। হায় কৌলিন্য!

জয় গুরু বলিয়া অনাথনাথ গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে সেই দুর্বৃত্ত অনাথের জ্ঞানের গভীরতা, মনের তন্ময়তা, এবং প্রাণের একাগ্রতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনাথ সকলকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আজ কন্যাকে বাটী লইয়া যাইবেন। অষ্টাহ শেষ হইয়াছে, গৌরীর মাতা আশাপথ চাহিয়া আছেন—তাঁর প্রাণের গৌরী শিবালয় হইতে আজ ঘরে আসিবে। তিনি কখনও কন্যাকে নিমেষের জন্য চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই, আজ আটদিন তিনি গৌরীর মুখে মা বুলি শুনেন নাই—প্রভাবতী তাহার জন্য আজ কত চঞ্চলা, তাহা মেয়ের মা মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণের বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে কুশণ্ডিকার পর সীমন্তে সতীর-গৌরব সিন্দুর পরিয়া তাহার কেমন শোভা হইয়াছে, সে সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য্য কিরূপ অনুপম রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্যও মায়ের প্রাণ বড় উতলা হইয়াছে কাজেই অনাথ আর কালবিলম্ব করিলেন না, বেহানকে অষ্টেপৃষ্টে নমস্কার করিয়া, পুত্রতুল্য রমণীমোহনের মুখচুম্বন করতঃ প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া বেলা একটার গাড়ীতে কন্যাকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামুঘোষ পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া শুভকার্য্য সম্পন্নের সুসংবাদ দিয়া, গৌরীর খুব প্রশংসাবাদ জ্ঞাপন করিয়া প্রাণের ভগ্নী প্রভাবতীর প্রাণে আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

রমণীমোহন এতদিন কোন প্রকার দায়িত্বের মধ্যে ছিলেন না, এইবার ধর্ম্মরক্ষা করিয়া কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য সংসার প্রবেশের পথে প্রথমে অর্থাগমের সুযোগ-সুবিধা করা একান্ত

আবশ্যক ! পাঠ শেষ হইয়াছে, এম, এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইব—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছাময়ী বাগ্দেবী তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। এক্ষণে ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর কৃপালাভে ধন্য হইতে পারিলেই এত কষ্ট, এত অর্থব্যয়ের সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

১৬

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে উচ্চ বংশের চরিত্রবান শিক্ষিত যুবকগণই সকল প্রকার বড় বড় সরকারী কার্য্যে নির্ব্বাচিত হইতেন। এই হিসাবে রমণীমোহন ডেপুটীগিরীপদ পাইবার জন্য আবেদন করিলে এবং কলিকাতা কলেজের অধ্যাপকগণ এবং এলাহাবাদের কণ্ট্রোলার প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার সুশিক্ষা, সচ্চরিত্রতা ও বংশ মর্য্যাদার বিষয়ে উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিলে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে উক্তপদে নিযুক্ত করিয়া প্রথমে কয়েক মাসের জন্য চব্বিশ-পরগণায় শিক্ষানবিশী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরে জাহানাবাদে বদলী করিয়া দিলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরেই রমণীমোহন এই লোভনীয় পদে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলে, সকলে গৌরীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল—"স্ত্রীভাগ্যে ধন" বিবাহ করিতে না করিতেই বৌটীর কেমন ভাগ্য দেখ না—কোথাও যাইতে হইল না, কাহারও উমেদারী করিতে হইল না, একেবারে এত বড় একটা উচ্চপদ ও এতটাকা উপার্জ্জনের পথ খোলসা হয়ে গেল—একেই বলে অদৃষ্ট !

আমরা বৌটাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—মেয়ে খুব পয়মন্ত, খুব সৌভাগ্য নিয়ে রুদ্রপুরের মুখুর্য্যে বাড়ী উজ্জল কর্ত্তে এসেছে, মরি মরি বউটীত নয় যেন লক্ষীঠাকরুণ, যেমনি রূপ, গঠন কি তেমনি, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! এক একটা স্ত্রীলোকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়—স্বামীগুণে যে তাহার সে সৌভাগ্যোদয় হয়, রমণীমহলে তাহার প্রচার আদৌ হয় না! রমণীমোহন যে এতদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখিলেন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কঙ্কালসার হইয়া গেলেন, তাহার উপর আচার-বিচারে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে ভগবানের কৃপালাভ করিনেল—রমণী মহলে রমণীমোহনের সে গুণের কিছু মাত্র তোলাপাড়া হইল না, তাহার কথা কেহ ঘুণাক্ষরেও মুখেও আনিল না, কথা প্রসঙ্গে প্রশংসা-ভাজন হইলেন গৌরীদেবী। গৌরী কিন্তু নিজ প্রশংসা শুনিলে বিরক্ত হইতেনকাণে হাত চাপা দিয়া তথা হইতে পলাইয়া যাইয়া মনে মনে দেবতাচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিতেন—ভগবন্! আমার হৃদয় দেবতার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করিয়া তাঁহার সুখের পথ প্রশস্ত করিয়া দাও: প্রভু সুখী হইলে আশ্রয়বাসিনী দাসীও তাঁহার অংশ-ভাগিনী হইয়া কৃতার্থ হইবে, গুণবান স্বামী গুণের পুরস্কার পাইয়াছেন—ইহাতে আমার প্রশংসা কিসের?

জননী সিদ্ধেশ্বরী পুত্রের এই অভাবনীয় উন্নতির কথা শুনিয়া দেবতা ব্রাহ্মণের নিকট প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বড় কষ্ট করিয়া, কতদিন উপবাসী থাকিয়া তিনি রমণীমোহনকে মানুষ করিয়াছেন। আজ তাঁহার সে পরিশ্রম, সে কষ্ট সার্থক হইয়াছে দেখিয়া আনন্দে গদ গদ কণ্ঠে, স্বর্গগত স্বামীদেবতার

শ্রীমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বলিতে লাগিলেন—প্রভু! তুমি রমণীকে শিক্ষিত করিবার জন্য কত কষ্ট করিয়াছিলে; পুত্রের পাঠের খরচ যোগাইতে তুমি একদিনের জন্য ত্রুটী কর নাই, আজ তোমার সেই প্রাণের রমণী তোমার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে ডিপুটী হইয়াছে; সে যেন তোমার বংশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, স্বর্গ হইতে তুমি তাহাকে সেই আশীর্ব্বাদ কর, আর দাসী যেন তাহাদের দুইজনকে অশেষ প্রকারে সুখী হইতে দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতে পারে, দয়া করিয়া তাহারও বিধান কর আর কতদিন এমন একাকিনী থাকিয়া তোমার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিব প্রভু! বলিয়া গললগ্নীকৃতবাসে স্বামী-চরণে হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইলেন।

গৌরী সোমত্ত মেয়ে, একটু বড় বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মে ঠিক গৌরী দানের মত আট-নয় বৎসরে তাহারে বিবাহ হয় নাই। অর্থের অনাটন ও নানা গোলযোগে তাহার বয়স প্রায় চৌদ্দবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ছিল, কাজেই সিদ্ধেশ্বরী ধূলা পায়ে দিন করিয়া তাহাকে ঘরে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আর কত দিন তিনি একাকিনী এই নির্জ্জন আবাসে বাস করিবেন! স্বামীর স্বর্গ গমনের পর রমণী পাঠের জন্য বহুদিন হইতে কলিকাতা বাসী, কাজেই তাঁহাকে পুত্রের মঙ্গলের জন্য, স্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা দিবার জন্য একাকিনী প্রাণ তুচ্ছ করিলেও বাধ্য হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এখন ছেলের বউ হইয়াছে, সোণার চাঁদ বধূটীকে যখন তাঁহার আঁধার গৃহ আলো করিবার জন্য ভগবান দয়া করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন আর

শেষের কটাদিন এমন একাকিণী ফাঁকা গৃহে থাকিয়া বৃথা কষ্ট করিবেন কেন? রমণীও তাহাতে রাজী নহেন; তিনি মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বিদেশ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন—মা! আর এমন কষ্ট করে থেকো না; ভগবান ত এখন অনাটন ঘুচাইয়াছেন, তবে আর একাকিনী থেকে কাজ নাই, শরীরে অসুখ বিসুখ আছে, তুমি একটা ভাল দিন দেখে তাকে এনো।

সিদ্ধেশ্বরীরও তাই ইচ্ছা—হাজার হউক ছেলের বউ, তাকে ত ঘর সংসার সমস্ত বুঝাতে হবে, এই সময় থেকে কাজকর্ম্ম শিখান ত দরকার; রমণী আমার কি চায়, কি না চায়, কি ভালবাসে, না বাসে সে গুলিত মাকে আমার শিখাতে হবে, নতুবা একেবারে নূতন হলে সংসার কর্ত্তে পার্ব্বে কেন? আর মেয়েও ত তত ছোট নয়?

রমণীমোহন গৃহ ত্যাগের এক সপ্তাহ পরে সিদ্ধেশ্বরী বধূমাতাকে গৃহে আনিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—আদরে মেয়ে, বোধ হয় বাপের বাড়ী থাকিয়া কোন কাজকর্ম্ম শিখে নাই। অনাথ বাটী থাকিত না, এথা সেথা করিয়া বেড়াইত, আর বেহান কি মেয়েকে তত কিছু কাজকর্ম্ম শিখাইয়াছেন? নয়নের মণি প্রাণের ধন মেয়েটীকে আদরে করিয়াই রাখিয়াছেন। কিন্তু গৌরী আসিয়া যখন সংসার হাতে লইলেন, শাশুড়ীকে যখন কাজকর্ম্মে অবসর দিয়া বলিলেন মা, আপনি এতদিন বুকে করিয়া এ সংসার বজায় রাখিয়াছেন, এখন আমাকে হুকুম করুন; আমি সমস্ত কাজকর্ম্ম করি, আপনি আপনার পরকালের কাজ করুন। যাহা না পারিব, তাহা আপনার নিকট জানিয়া লইব; কিন্তু কই, গৌরীর সংসারের কার্য্যত অজ্ঞানা কিছু

নাই, এত অল্প বয়সে মেয়েকে এমন গৃহিনীপণা বেহান কেমন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন? মরি মরি দরিদ্রের কন্যা বলিয়া পাছে শ্বশুর বাটীর কথা শুনিতে হয়, এইজন্য তিনি কোন কাজ শিখাইতে বাকী রাখেন নাই! ইস্তক গোশালা হইতে ঠাকুর সেবা, অতিথি অভ্যাগতের কাহাকে কিরূপ আদর-আপ্যায়ন করিতে হয়, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন। আমাকে আর বিন্দু বিসর্গও শিক্ষা দিতে হইতেছে না, এইজন্য বলে ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আন্তে হলে গরীবের ঘর থেকেই আন্‌বে, তাহলে আর গৃহস্থালীর মঙ্গলা-মঙ্গল বিষয়ে কিছু ভাবতে বা দেখতে হবে না। মার আমার একদণ্ড বিশ্রাম নাই; সংসারের কাজ কম থাক্‌লেও সমস্ত দিন, রাত্রি বারট অবধি তুলাপেজা, সুতা তোলা, কেঁথা সেলাই প্রভৃতিতে সদাই ব্যস্ত আমাকে কড়ার কুটাটী পর্য্যন্ত নাড়িতে হয় না; বেটীর পাল্লায় পড়ে আমার বাত ধরবে দেখ্‌ছি। যদি কোন একটী কাজ কর্ত্তে যাই, অমনি মা আমার তাড়াতাড়ি এসে, "থাক মা থাক্ আমি করছি" বলে, তাহা এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন, যা আমরা সে কালের হয়েও তেমন পরিপাটীরূপে কর্ত্তে পারি না।

রমণী মোহন জাহানাবাদে বাসা ভাড়া করিয়া আছেন। সিদ্ধেশ্বরী পুত্রের সহিত যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু রমণীমোহন বলিলেন—মা! তুমি ভিটে ছেড়ে আমার সঙ্গে গেলে, আমার এই সর্ব্বার্থসার তীর্থ, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি অরণ্য হয়ে যাবে। তুমি মা বধূকে লইয়া ইহার উন্নতি কর, আমি মাসিক পঞ্চাশ টাকা খরচ রাখিয়া তোমাকে সমস্ত পাঠাইয়া দিব। সিদ্ধেশ্বরী সে কালের মেয়ে মানুষ, বলিলেন—

বাবা ! আমরা দুইটী মেয়ে মানুষ ঘরে থাক্‌বো, প্রতি মাসে অত টাকার, হেঁফাজাৎ আমি কর্ত্তে পার্ব্বো না ; আমাদের দুজনের পঁচিশটী টাকা পাঠিয়ে দিও—তারপর তুমি ভাল খেয়ে, ভাল পরে যা বাঁচবে, তা ভাল করে জমা রেখো, যখন দরকার হবে চেয়ে নিব ! বাড়ী ঘর কর্ত্তে হলে, তোমাকে ত ছুটী নিয়ে আস্‌তে হবে—আমি বাহিরের সে সব বন্দোবস্ত কি কর্ব্বো ? রমণী তদুত্তরে বলিলেন—হাঁ মা ! বাড়ীঘর নাই, তাত কর্ত্তেই হবে, তখন আস্‌বো ; কিন্তু তোমাদের এই পঁচিশ টাকায় হবে ত ?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া বলিলেন—সে কি রে বাবা ! ছগণ্ডা এক টাকায় দুটো পেট : আর না হয় একটা রাখাল রাখবো, তা আর চলবে না, খুব চলবে ? এখন দিন দুনিয়া খারাপ পড়েছে তাই, নইলে এতে যে দোল দুর্গোৎসব হতো বাবা।

বিদেশ বিভুমে রমণী কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চান না. বিশেষতঃ বাড়ী ঘর ফেলিয়া গেলে আর ইহার প্রতি মায়া থাকিবে না, জননী জন্মভূমি বলিয়া যে একটা প্রাণের টান, তাহা লোপ হয়ে যাবে। রমণীমোহন পল্লীর মোহন মোহজাল কাটিতে রাজী নহেন। এ দিকে জামাতা যাহার তাহার হাতে খাইতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া প্রভাবতী তাঁহার তৃপ্তির জন্য রায় গিন্নীর জনৈক বষীয়সী আত্মীয়াকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি মায়ের মত করিয়া রমণীকে আদর যত্ন করিবেন, খাওয়া পরা দিবেন।

রমণীমোহন জাহানাবাদে বেশ সুখে আছেন, হাকিমী কাজে তাঁহার বেশ সুখ সম্মান ঘোষিত হইয়াছে। অদ্যাবধি সমস্ত মোকর্দ্দমায়

তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত রায় বহাল করিয়া সরকারে যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তিও সাধারণের সম্মান সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ডেপুটী রমণীমোহনের নাম এ প্রদেশের আবালবৃদ্ধ বণিতার জানিত হইয়া পড়িয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্যে তিনি গরীবের মা বাপ, অবসর সময়ে তিনি গ্রামবাসী দরিদ্রগণের প্রতি দয়া দেখাইয়া থাকেন এবং গ্রামের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জেলার উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর হওয়ায় চারিদিকে তাঁহার প্রতিভার পূজা হইতে লাগিল।

১৭

ছেলে মেয়ের সুখ্যাতি শুনিলে মাবাপের প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে; অক্লান্ত পরিশ্রমে এত দিন ধরিয়া মানুষ করিবার একটা সার্থকতা মনে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন।

শ্বশুর বাড়ী গিয়া গৌরীর খুব সুখ্যাতি হইয়াছে: শাশুড়ী তাহাকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন: বউমা বলিতে অজ্ঞান হন; সংসারের সকল কার্য্য তিনি গৌরীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; মেয়ের এরূপ প্রশংসা বাদ শুনিলে কোন মায়ের প্রাণ না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? আর জামাইও হইয়াছে—মনের মতন, এমন সোণার চাঁদ পাত্র খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটিয়া উঠে।

এখন প্রভাবতীর দুঃখময় জীবনে সুখের প্রভাত-আরতি আরম্ভ হইয়াছে, স্বামী দেবতার শুভাগমনে সে আরত্রিক শঙ্খের মঙ্গল নিক্কণ

হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে বাজিয়া উঠিয়া তাহার জীবন-সরোবরে আনন্দের তুফান তুলিয়া দিয়াছে; সে তুফান—বাণে চির রাহুগ্রস্ত বদনশশাঙ্ক ফুল্ল ভাব ধারণ করিয়া আবার সুগোল সুপুষ্ট লালিমা মণ্ডিত হইয়াছে, মৃদু মধুর হাসি রাশিতে বহুদিনের শুষ্ক অধরোষ্ঠ যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাহু গ্রাস মুক্ত হইলে চাঁদের যেমন শোভা হয়, দুরন্ত শীতঋতুর অবসানে প্রকৃতির কোলে প্রাকৃতিক বিমল বিভা যেমন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে শোভা সৌন্দর্য্যের আস্পদ করিয়া তুলে—প্রভাবতীর ও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তাহার দেহের সৌন্দর্য্য, রূপের জ্যোতি আবার পূর্ণ মাত্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে, অথচ তাহাতে কঠোরতা নাই, বদনের ভাব কমণীয়তায় মাখান—অহঙ্কারের উগ্রভাব তাহাতে আদৌ স্থান পায় নাই। মনের স্ফূর্ত্তি হৃদয়ের আনন্দই যে শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের একমাত্র মহৌষধ, তাহা আজকাল প্রভাবতীকে দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

অনাথ এখন কলিকাতাতেই আছেন-কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতেছেন কিন্তু কি কাজ কর্ম্ম করিবেন? বাল্যে ত তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই! বিবাহ করিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীর স্কন্ধে চাপিয়া কাল যাপন করিবার মত তিনি জীবন গঠন করিয়াছিলেন; স্বাবলম্বী হইয়া স্বপদে দাঁড়াইয়া কোন কাজ করিবার মত কিছুই তাঁহার শিক্ষা হয় নাই। পর-মুখাপেক্ষী হইয়া, পরের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন যাপন করিব—ইহাই তাহার মনোগত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইচ্ছাময় তাহার সে ইচ্ছার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন,—একে একে তাঁহার সমস্ত ধনবতী পত্নীই অকালে কাল কবলে কবলিতা হইয়াছেন, আছেন—কেবল দরিদ্রা

প্রভাবতী। তাঁহার অবস্থাও এখন তাদৃশ অস্বচ্ছল না হইলেও, ধাত্রী চিকিৎসায় তিনি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিলেও, অনাথ আর সে অনাথ নাই, তিনি এখন আব স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে রাজী নহেন।

অনাথনাথ পুরুষ পুঙ্গব, এখন আর সেরূপ ভাবে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন না; ঠিক মানুষের মত, পুরুষশ্রেষ্ঠের মত, ঠিক স্ত্রীর স্বামীর মত মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া জীবন যাপন করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। দেবানন্দ বলিয়াছেন—মানুষ হইয়া পশু জীবন বহন করিও না; জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া নিতান্ত অপদার্থের মত জীবন ভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল, তাই তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়াছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি আবার মনুষ্যোচিত কর্ম্মের অবতারণা করিয়া ধন্য হইতে আসিয়াছেন। অনাথনাথ বালো কৃতবিদ্য না হইলেও বংশোচিত একটা শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার ছিল, তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য, নিখুঁত গঠান প্রণালী তাঁহার কার্য্যে দৃঢ়তা এবং সামাজিক বাক্যালাপে এমন পারদর্শীতা ছিল-যাহাতে তাঁহাকে সহজে কেহ মূর্খ বলিয়া অনুমান করিতে পারিত না, দেবানন্দের ন্যায় মহাপুরুষের নিকট অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিষয়ে তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞ—সাধন ভজনশীল সাধক না বলিয়া থাকিতে পারা যাইত না!

প্রভাবতী বিদুষী রমণী হইলেও একদিনের জন্য স্বামীকে মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করেন নাই বা তাঁহার সে গুণহীনতার বিষয় মনের কোণে স্থান দিয়া নিজে স্ফীতবক্ষ হন নাই। অনাথকে যে তিনি চিরদিন

স্বামী, মাথার মণি, হৃদয়ের দেবতা বলিয়া মনোমন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন—একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি? এখন অনাথের যে অবস্থা তাহাতে তাঁহার মত পতিপ্রাণা রমণী তাঁহার পদে মাথা রাখিয়া দাসীত্ব স্বীকার করিতে কোন ক্রমেই কুণ্ঠিত হইবেন না!

একদিন আহারাদির পর সকলে একত্র বসিয়া কন্যাজামাতার উন্নতি বিষয় আলোচনা করিতেছেন। প্রভাবতীর মাসীমাতা কমলমণী আর পাড়ার দূর সম্পর্কীয়া একজন দিদিমা, নাতিনী জামাই অনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বিবাহে ভবিতব্যই দৃঢ—যেখানে হইবার সেই স্থানেই হয়, মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারে না, আহা! ভদ্রলোকের ছেলে দামু কি গৌরীর বিয়ের জন্য কম করেছে. কিন্তু বর যে হাতের মধ্যে রয়েছে—তাহা কি কেহ ঘুণাক্ষরেও ভাবিয়াছিল?

দামুর আজ শরীর টা তত ভাল নয় বলিয়া দোকানে যায় নাই—সে বলিল—দিদিমা! খোঁজাই মানুষের কাজ, মিলন ভগবানের ইচ্ছায় হয়, ইহাতে কাহারও হাত নাই, নতুব কোথা হইতে কি হইল দেখলে ত? "তাইত বল্‌চি—দা:" হতভাগারা কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছিল? বলিয়া তিনি চরকায় "ফো" যোগান দিলেন?

অনাথ বলিলেন—দিদিমা! বিপদহারী ত বিপদুদ্ধার করলেন, তবেই দেখ, মানুষ মানুষের অনিষ্ট কর্ত্তে সহজে পারে না—যদি সে পাপে না থাকে।

দিদিমা বলিলেন—তুমি এসে পড়েছিলে বলেই ত দাদা!

অনাথ বলিলেন —সেও ত তাঁর ইচ্ছা গো, নতুবা এত দিন আসিনি কেন ?

প্রভাবতী মাসীমার নিকট কপাটের আড়ালে বসিয়া ভুলা পিঁজিতে ছিলেন, ধীরে ধীরে মুখটী নত করিয়া বলিলেন—আদরিণী গৌরী যে আবার এত ঘরণী গিন্নী হয়ে এত শীঘ্র সুখ্যাতি লাভ কর্ব্বে তা আমি কখন মনেও ভাবিনি ?

অনাথ স্ত্রীর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কেমন পাকা হাতের তৈয়ারী করা, শিক্ষয়িত্রী ভাল হলে ছাত্রীর অখ্যাতি কুখ্যাতি হবে কেন ? গর্ভ্বধারিণী যার ভাল তার মেয়ে কি খারাপ হয়,—ক্ষেত্র গুণেইত ফল ?

দামু হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন—বীজ গুণে, কিন্তু তখন সে কথা অপ্রাসঙ্গিক হয়, ভগ্নীর সমক্ষে ভগ্নীপতিকে তাহা বলা উচিত নয় বলিয়া চাপিয়া গেল।

দিদিমা বলিলেন—ভাই, করুণা মায়া যাবার পর মনে করে ছিলাম—পোড়ারমুখী প্রভার জীবনটা বুঝি তিক্ত হয়েই রইলো, সুখের আস্বাদ বুঝি সে পেলে না, তা ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন তুমি এসে পড়েছো !

অনাথ বড় তামাসা প্রিয়, মনের মত কথা হইলে তিনি যখন তখন তামাসা করিয়া থাকেন : পাত্রাপাত্র তত বিবেচনা করেন না, তাই বলিলেন—দিদিমা ! পোড়ার মুখে তিতই ভাল লাগে, তাহাতে রুচি বাড়ে পেট পুরে খেলেও বদ্ হজম হয় না। স্বামী স্ত্রী বহুদিন একত্র থাকলে তত সুখ হয় না। ভালবাসা জিনিসটা একঘেয়ে ভাল নয় বলে

শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে রাধার সহিত বিরহের সৃষ্টি কর্ত্তেন. তাতে প্রাণের টান টা আরও অটুট হতো !

দিদিমা ও নাৎজামাইয়ের রসিকতা শুনিয়া প্রভাবতী মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া যাইতেছিলেন, দেখিয়া অনাথ বলিলেন—দেখ, আমি অনেক দিন এসেছি, প্রভুর জন্য প্রাণটা কেমন করছে, তাঁর শ্রীচরণ দর্শন না করে মনটা খারাপ হয়েছে, আমি কালই কাশী চলে যাব—একটা কাজ কর্ম্ম না করলে ত আর চল্‌বে না ? স্বামী স্ত্রীর কথা আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল।

স্বামীর এই হৃদয় ভেদী কথা শুনিয়া প্রভাবতীর মুখটী আবার বিবর্ণ ভাব ধারণ করিল—বিধি হারানিধি এত দিনের পর মিলাইয়া দিলেন, মনে করিয়াছিলেন—অবিচ্ছেদে এ বস্ত্র মাথায় করিয়া রাখিবেন। কিন্তু সহসা এ আবার কি কথা, তিনি চলিয়া যাইলে আমি একাকিনী কেমন করিয়া থাকিব ? তখন গৌরী আমার নিজের ছিল, কাছে কাছে থাকিত দুঃখের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলে সে জ্বালা নিবারণ হইত ; এখন সেও পরের হইয়াছে, কষ্টের সময় তাহাকেও পাওয়া যাইবে না, তবে আর এ জীবনে ফল কি ?

প্রভাবতীর ভাব দেখিয়া অনাথ বলিলেন—প্রভা ! আমি বহুদিনের জন্য যাইতেছি না, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, আমার অভিষেকটা বাকী আছে, গুরুদেবের নিকট তাহা শেষ করিয়া লইব, আর কাজ কর্ম্ম কিরূপ করিব, তাহার একটা উপদেশ লইয়া আসিব, তিনি সংসার ত্যাগী সিদ্ধ-পুরুষ, কখন কোথায় চলিয়া যান, তাহার ত স্থির নাই ?

প্রভাবতী। আমিও তোমার সঙ্গে যাইব,—আমারত গুরুমন্ত্র হয়

নাই। জীবনটা বিফলে যাচ্ছে শাস্ত্রমত, দীক্ষিতা না হলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না, আমি আর কত কাল এমন করে থাক্‌বো? তুমি যাহাকে গুরু করেছো, হিসাব মত আমারও তাঁহার কাছে দীক্ষিত হওয়া উচিত। মনে মনে করিলেন—এ দেবানন্দ কে? পিতার ইষ্টদেবতা সেই মহাপুরুষ না কি? তবে প্রভাত, তাঁর নাম জানেন না—এখন তিনি কোন্ নামে পরিচিত।

অনাথ। হাঁ তা বটে, তবে কাজকর্ম্ম করে আমার হাতে কিছু অর্থ হ'লেই ভাল হতো?

প্রভাবতী বলিলেন—অর্থের অভাব কি, তোমার আদেশ মত আমিও যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি, তবে অধর্ম্মে নয়—ধর্ম্মে, পরের উপকার করিয়া, পোয়াতী প্রসব করাইয়া আমিও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি। এই দেখ কত টাকা, এ সবত তোমারই, আমার ধন কি তোমার নয়, তুমি দামুদার নিকট যে ভাবে উপায় কর্ব্বে বলে ছিলে, আমি সে ভাবে উপায় কর্ব্বো কেন? পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর কি কোন দৈবশক্তি নাই? মা সতী সীমন্তিনী, আমাকে শক্তি দিয়াছেন, আমি সেই শক্তি বলে এত অর্থ, লাভ করিয়াছি—এক্ষণে তুমি ইচ্ছামত ইহার যথেচ্ছ অংশ গ্রহণ কর; অর্থের জন্য কোথাও যাইতে হইবে না! এই বলিয়া প্রভাবতী টাকা ও গহনার বাক্স আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

দরিদ্র অনাথ সে টাকা দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন প্রভা! এ করেছ কি, এত টাকা তুমি ধাত্রী চিকিৎসায় উপার্জ্জন করেছ! কুলের কুলবধূ হইয়া ঘরের বাহির হও কেমন করিয়া, এতে ত তোমার প্রতি সকলেই সন্দেহ করিবে?

প্রভাবতী। কিন্তু তুমি দামুদার নিকট কি বলিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে বলিয়াছিলে—মনে নাই কি? যখন আমার ঘোর অভাব হইল—অর্থ বিনা দিন চলে না, মেয়ের বিয়ে হয় না, তুমি ত দেখলে না, কাজেই আমাকে একটা পন্থা অবলম্বন কর্ত্তে হলো, যাহাতে জাতি-কুল-মান-ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া টাকা উপায় করিতে পারা যায়। সতীর গতি মা ভগবতীও শক্তি দিলেন—আর পিতার গুরুদেব প্রদত্ত মন্ত্র বলে আমি যথায় গিয়াছি, তথায়ই কৃতকার্য্য হইয়াছি—হাত দিবামাত্রই প্রসূতি সুপ্রসব হইয়াছে। অভিভাবকগণ খুসী হইয়া টাকা দিয়াছে, আমি ত কাহার নিকট কিছু চাই নাই—তাহারা ঘরে দিয়া গিয়াছে, যাইবার সময় গাড়ী বন্ধ করিয়া খুব সাবধানে হয় মাসীমা, না হয় দিদিমা সঙ্গে যাইতেন—আমি একাকিনী কোথাও যায় নাই, কখনও কখনও দামুদাও সে বিষয় সতর্ক থাকিতেন। তবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—কোন ক্রমে গৌরীর বিবাহ হইয়া গেলে, আহারাভাবে যদি মরিয়া যাই, তাহাহইলেও কখন বাটীর বাহির হইব না, দায়ে পড়িয়া করিয়াছি—এখন দায় উদ্ধার হইয়াছে, আমিও কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছি, তবে যাহা করিয়াছি, দোষ হইয়া থাকিলে তজ্জন্য মার্জ্জনা কর।

অনাথ নিজের নির্বুদ্ধিতা, নিজের ক্ষমতা হীনতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। দারুণ কন্যাদায়ে সতীর আন্তরিক চেষ্টার জন্য মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

১৮

কৃতকর্ম্মের জন্য অনাথের প্রাণে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে; তাহার জন্য সে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া দামুঘোষ আর কোন কথা উত্থাপন করিল না। ভগ্নী প্রভাবতীর প্রতি যে তাহার প্রাণের টান পড়িয়াছে, তাহাকে সুখী করিবার জন্য শেষ দশায় যে তাহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট ভাবিয়া একদিন বলিল—ভাই অনাথ! সৎপথে থাকিলে মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা হয় না, সুখে হউক, দুঃখে হউক, সে স্ত্রীপুত্র লইয়া একপ্রকারে কাল কাটাইয়া দিতে পারে. বিশেষতঃ তোমার সংসার তত বড় নহে, ভগ্নী প্রভাবতী অন্যান্য রমণীর মত বিলাসিনীও নহে. যে তাহাকে লইয়া সংসার করিতে তোমার কষ্ট হইবে, সে মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইয়া স্বামী সুখে সুখিনী হইতে পারিলেই নিজকে ধন্য জ্ঞান করিবে। আর গৌরী যে পাত্রে পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার ভাবনা আদৌ তোমায় ভাবিতে হইবে না। যদি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, দৈব দুর্ঘটনা যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে সে রাজরাণী হইবে, রমণী রাজার আসন লাভ করিবে, তাহাদের কপালে এমন সৌভাগ্য যোগ রহিয়াছে. আমি বিবাহের পূর্ব্বে গণাইয়া দেখিয়াছি!

তোমাকে উদরান্নের জন্য প্রভাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে হইবে না বা কাহারও দাসত্ব করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণের দাসত্ব পাতিত্যের লক্ষণ: বরং আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি করিতে দোষ নাই—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

ভাই! যখন তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে এতাদৃশ মতিমান হইয়াছ, তখন পরের দাসত্ব করিলে কখন নিজের কাজ করিবে? অতএব আমার ব্যবসাটী এখন বেশ চলিতেছে; তুমি উহার ভার লইয়া ধর্ম্মভাবে পরিচালন কর। আমার আর কে আছে ভাই! যে সংসার—মায়ার জড়িত হইয়া এখনও পরকাল নষ্ট করিব?' এতদিন তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্যই আমাকে সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল, নতুবা আমি বহু পূর্ব্বেই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম। এক্ষণে তুমি আসিয়াছ, ভগবান তোমাকে আনিয়া দিয়া আমার সে দিনের বাক্য সফল করিয়াছেন, এইবার আমি তাঁহার কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইব, গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিব। তুমি জন্ম দুঃখিনী প্রভাকে লইয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর।

দামুঘোষ জাতিতে তত উৎকৃষ্ট না হইলেও ত্যাগে একজন মহাপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সংসারে তাহার কেহ নাই, এইজন্য নিস্বার্থভাবে একটী ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনার বিত্ত-বিভব সমস্ত অকাতরে উৎসর্গ করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার শেষ সম্বল কলিকাতা সহরের ব্যবসাটীও তাহাদের ভবিষ্যৎ হিতের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রাণে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না।

দামুর অকাতর ও অকপট পরোপকার বৃত্তি, তাহার হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখিয়া অনাথনাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—ভাই দামু! তুই কি মানুষ না স্বর্গের দেবতা? আমি এত দিন তোকে চিনিতে না পারিয়া কত কটুকাটব্য বলিয়াছি, তজ্জন্য তোর এই অধম দাদাকে মার্জ্জনা কর। অনাথ দামুর গলা জড়াইয়া আনন্দাশ্রনীরে তাহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

দামু বলিল—ভাই! মানুষ হইয়া মানুষের দুঃখে যদি হৃদয় না গলিল, তার তবে মনুষ্যত্ব কোথায়? আমি বেশী কিছু করি নাই, আপনার শ্বশুর স্বর্গীয় বাড়ুজ্যে মহাশয়ের কাছে আমি যেরূপ উপকৃত, তাহাতে তাঁহার কন্যার জন্য আমি শতাংশের এক অংশও করিতে পারি নাই; পরোপকারে আমি সে প্রভাকরের নিকট খদ্যোৎ অপেক্ষাও লঘু; তুমি তার জন্য কিছু মনে করো না; আমাকে এইবার সংসার হইতে অব্যাহতি দাও, বলিয়া অনাথের পদধূলি লইল!

অনাথ বলিলেন—ভাই! তুই যদি আমাদের ছেড়ে চলে যাস্ তা হলে আমাদের এ পিচ্ছিল সংসার পথে পরিচালিত করিবে কে? তুই যে আমাদের শিক্ষাদাতা; তোর সে দিনকার তীব্র কঠোর বাক্যবাণই যে আমাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়াছে, আমার অন্ধকার জীবনের পথে আলো আনিয়াছে; সে দিন তুই আমাকে সেইরূপ ভাবে শ্লেষ উক্তি না করিলে আমার চৈতন্যোদয় হইত না; স্ত্রীবিয়োগে বাটীর বাহির হইয়া শ্রীগুরুর আশ্রয়ে আমার এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তনও ঘটিত না!

দামু বলিল—"কে সে মহাপুরুষ, কোথায় তাহার দর্শন পাইলে অনাথ?" অনাথ বলিলেন,—জানি না তিনি কে, বলিতে পারি না—তাঁহার কি রূপ, মানুষের সেরূপ রূপ তাহা হয় না, নিশ্চয়ই তিনি দেবতা; আমার অন্ধকারময় জীবন পথে আলোকবর্ত্তী ধরিয়াছেন। তিনি কখন কাশীতে, কখন হরিদ্বারে, কখন প্রয়াগে, কখন রামেশ্বরে, কখনও নাসিকে অবস্থান করেন, তাঁহার একদিন মাত্র দর্শনে, সেই অমিয় মধুর বাক্য শ্রবণে আমার অসাড় প্রাণে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার চক্ষের সেই তীব্র যোগ-জ্যোতি পূর্ণ কটাক্ষ আমার উপর পতিত হইলে, চরিত্রগত সমস্ত

মালিন্য ধৌত করিয়া আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিল, আমি তাঁহার চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, কতক্ষণ যে সেরূপ ছিলাম—তাহা জানি না, তার পর দেখিলাম,—আমি একটী শোভন-সুন্দর প্রকোষ্ঠে শুইয়া আছি, নানাবিধ সুখাদ্য সম্মুখে করিয়া একটী মাতৃমূর্ত্তি আমাকে ভোজনের জন্য বলিতেছেন। তাঁহার কমনীয় কান্তি, বদনের জ্যোতি দেখিলে নয়ন ঝাঁধিয়া যায়—প্রাণ ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়! আমি জোড়হস্তে প্রেমপুরিত নেত্রে, করুণ কণ্টকিত দেহে কাঁদিয়া ফেলিলাম। মাতা বলিলেন—বৎস! ভয় নাই: প্রসন্নময় আজি তোর প্রতি প্রসন্ন, জীবন ধন্য কর, প্রসাদ গ্রহণে পরিতপ্ত হ। আমার তিন দিন খাওয়া হয় নাই, মায়ের ইঙ্গিতে উদর পুরিয়া আহার করিলাম; সে অমৃতোপম প্রসাদ-আস্বাদ আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। সন্ন্যাসিনী জননীর মত আমাকে এটা খাও সেটা খাও বলিয়া উদর পুরিয়া খাওয়াইয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন, আমি মনে মনে অনেক রাত্রি অবধি সেই যোগ ভবনে বসিয়া রহিলাম। রজনী যখন গভীর গম্ভীর, জলকোলাহল যখন সুষুপ্তির কোলে অচেতন, তখন জলদ গম্ভীর স্বরে "তারা ব্রহ্মময়ী" উচ্চারণ করিতে করিতে আমার হৃদয় দেবতা সেই যোগীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—বৎস! সুস্থ হইয়াছ ত? তার পর দেবতা দয়া করিয়া পর দিন আমার কর্ণে শত প্রণোদিত হইয়া বীজমন্ত্র প্রদান করিলেন। আমি যে এত মূর্খ, তথাপি তাহাতে যেন আমার হৃদয় দ্বার উদঘটিত হইল, আমি শাস্ত্রালোচনা রত হইলাম, আর অনবরত গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম, তিন দিন এইরূপ জপের পর প্রভু বলিলেন যাও বৎস! আর পতনের সম্ভাবনা নাই, এইবার সংসারে সংসারী হও

কর্ম্ম কর, কর্ম্মই যোগ। তোর একমাত্র পুত্রী গৌরীর বিবাহে গোলযোগ হইয়াছে, সত্বর কাশীপুরে গমন কর। আমি বলিলাম—প্রভু! আর আমার সংসার ধর্ম্মে আস্থা নাই, আপনার চরণ ছাড়িয়া আর নরকে যাইব না? তিনি দন্ত কড় মড় করিয়া বলিলেন—এখনি যাও, সংসার নরক নহে, স্বর্গ অপেক্ষাও মহৎ স্থান, যদি তুমি দেবভাবে স্বর্গের অভিনয় করিতে পার, তাহা হইলে সংসারই স্বর্গ, আর নরকের অভিনয় করিলে তাহা নরক অপেক্ষাও পুতিগন্ধময়, স্বর্গ বা নরকের সৃষ্টি তোমারই হাতে, আর অপেক্ষা করিও না—যাও। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিলাম। এত দিন নানা কাজে বিব্রত থাকিয়া তোকে বলিতে পারি নাই, তাই আজ তোকে নিভৃতে পাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

অনাথের সরল প্রাণের তরল উচ্ছাস, খোলা প্রাণের খোলা কথা শুনিয়া সংসারের কর্ম্মযোগী দামুঘোষ অবাক হইয়া বলিল—ধন্য অনাথ! কোথায় তুমি এ মহাপুরুষের দেখা পেয়েছিলে?

অনাথ বলিলেন প্রয়াগের এই ঘটনা, তারপর তিনি কোথায় গিয়াছেন, তার সন্ধান জানি না। তবে দুই বৎসর পরে তিনি কাশীতে আমাকে দেখা করিতে বলিয়াছেন।

স্বামীর প্রতি মহাপুরুষের কৃপা বিষয়ক কথাগুলি শুনিয়া প্রভাবতীর প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি অনাথকে প্রাণে প্রাণে সুদৃঢ়রূপে গাঁথিয়া লইলেন, পূর্ব্বের এত নির্য্যাতন, এত উৎপীড়ন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া পরম-গুণাকর স্বামী—সাগরে আত্মহারা হইলেন।

দামুঘোষের আর বুঝিতে বাকী রহিল না। অনাথ যে কাহার কৃপা লাভ করিয়াছেন—তাহা সে বুঝিতে পারিল। তাহারই হৃদয় সর্ব্বস্ব করুণ-

ময় অভীষ্ট দেবতা যে অনাথের পাপময় কঠোর জীবন-পথ পুণ্যের পূতত্তম তুহিন পাতে কোমলতাময় করিয়াদিয়াছেন, তাহা বুঝিতে দামুর বেশী বিলম্ব হইল না, নতুবা এ কঠোরতা কি এত শীঘ্র এমন কোমলতায় পূর্ণ হয় ; মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, মরুভূমিতে যে বাণ ডাকিতে দেখা যায় ধন্ত অনাথ !

গুরুদেব বলিয়াছিলেন—পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তীর্থ ভ্রমণের পর আমার সহিত শেষ দেখা করিও, অনাথ যাহা বলিল—তাহাতে ত আর কাল বিলম্ব করা চলে না। দামুঘোষ সেই দিনই অনাথ ও তদীয় পত্নী প্রভাবতীকে সমস্ত দান করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—দাদা ! দুঃখিনী ভগ্নীকে এতদিন প্রাণের মধ্যে আরবিয়া, অসীম কষ্টে তাহার দুঃখসমুদ্র পার করিয়া এখন কোথায় যাইতেছ ? দামু হাসিতে হাসিতে বলিল—দিদি প্রভা ! হিন্দু স্ত্রী যাহাকে পাইলে আর কিছু চায় না, যাহার তুল্য লোভনীয় বস্তু তাহাদের ত্রিজগতে আর নাই, স্বর্গ-সুখ যাহার জন্য তাহারা তুচ্ছ বোধ করিতে পারে, আমি তোমাকে সেই পরম দেবতা স্বামীর পদতলে সুখে বিশ্রাম লাভ করিতে দিয়া আনন্দে সংসার ত্যাগ করিলাম। অনাথ এখন আর মূর্খ বর্ব্বর নাই, দেবতার কৃপায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে ; এইবার উভয়ে ধর্ম্মের সংসারে কর্ম্মের সাধনা করিয়া দেবত্ব লাভ কর, শ্রীগুরুর কৃপা কটাক্ষ তোমাদের উপর পতিত হউক। আমার সংসারের সাধ মিটিয়াছে, আর কাঁদিও না—আমি চলিলাম। পরোপকারী উগ্রক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর গুপ্ত-যোগী দামুঘোষ রজনীর গাঢ় অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ কোথায় মিলাইয়া গেল।

১৯

দামুঘোষের মত বিশুদ্ধ চরিত্র ত্যাগধর্ম্মী যুবকের গৃহত্যাগে কেবল প্রভাবতী, অনাথ, কমলমণি কেন, যে শুনিল সেই দুঃখিত হইল। যাহার সহিত সে একবার মাত্র আলাপ পরিচয় করিয়াছিল, সেই দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন পরোপকারী যুবা কলিতে আর মিলিবে না

দামুর গৃহত্যাগের পর অনাথকে স্থানান্তর গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ প্রভাবতীও কমলমণিকে দেখিবার আর কেহ নাই; অন্য সময় হইলেও বা কথা ছিল, নির্ম্মম কঠোর অনাথ সব করিতে পারিত কিন্তু এখন অনাথের হৃদয় দয়ামায়ার আকর হইয়াছে, প্রাণ কোমলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন ইহাদের বিপন্ন করিয়া যাইবার ক্ষমতা তার নাই। কাজেই সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মের বোঝা বহনে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি দামুঘোষের কারবার পরিচালন করিতে যত্নবান হইলেন।

আজ কয়েক বৎসর হইল—গৌরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে এখন ঘরণী গৃহিনী হইয়াছে, মনের সুখে স্বামীর সংসারে প্রাণপাত করিতেছে, এখন সে আর বাপের বাড়ী প্রায়ই আসে না, তবে প্রভাবতীর মন খারাপ হইলে অনাথ রুদ্রপুরে যাইয়া তাহার তত্ত্ব লইয়া আসেন, বা দুই এক সপ্তাহের জন্য আনিয়া পত্নীর চিত্ত বিনোদন করেন। গৌরী এখন বাপের বাড়ী থাকিলে সিদ্ধেশ্বরীর সংসার চলে না, এতদিন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, সংসারে কাজও কম ছিল। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কাজেই ব্যবস্থা করিবার লোক চাই, সিদ্ধেশ্বরী বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন গৌরী না দেখিলে আর কে দেখিবে?

গৌরীদেবী একালের বিদুষী স্ত্রীলোক হইলেও বিলাস-বিভ্রমে মত্ত থাকেন না। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া ছড়াঝাঁট দিয়া গোসেবা করেন, তারপর শাশুড়ীর পূজার উদ্যোগ করিয়া দেন। তিনি পূজায় বসিলে গৃহের নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য রাখালকে হাটে পাঠাইয়া দিয়া রন্ধন শালায় প্রবেশ করেন। গৃহে দুই তিন জন লোক কিন্তু অতিথি অভ্যাগত আসিলে এখনকার গৃহস্থের মত বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না। রমণীমোহনের গৃহদ্বার সমস্ত দিন উন্মুক্ত থাকে, অতিথি আসিয়া আহার করিতে চাহিলে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে, অন্য সময় আসিলে মুষ্টিভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। অতিথি অভ্যাগত দুস্থ ব্যক্তি গৃহীর গৃহে প্রতিপালিত হয়, এই জন্য হিন্দুর গৃহস্থাশ্রম পুণ্যতীর্থ—আদর্শ সংসার পাতিতে হইলে এই দিকে পূর্ণলক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সিদ্ধেশ্বরী ও গৌরীদেবী এ কার্য্যে কখনই বিরক্ত নহেন বরং তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলে নিজকে ধন্য জ্ঞান করেন।

গৌরী বিলাসিনী নহেন; এমন অর্থবান্ বড়লোকের স্ত্রী হইয়াও তিনি মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট, নানাবিধ অলঙ্কার এবং পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাহাকে কখন কেহ বাহার দিতে দেখে নাই; অথবা তাঁহার কৃত্রিম সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রূপের বাহার বাড়াইবার আবশ্যক ছিল না—বিধিদত্ত রূপেই তিনি চির সুসজ্জিতা; সেই পদ্মের মত চক্ষু, চন্দ্রের মত বদন শোভা, আর নিখুঁত গঠন পরিপাঠ্য দেখিলে তাঁহাকে প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হইত, বৃথা কৃত্রিমতায় তাহা বাড়াইয়া লাভ কি? বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হানিকরা হয়

মাত্র। এমন বড় লোকের স্ত্রীর এ মন কমণীয় স্বভাব দেখিয়া পাড়ার অনেক স্ত্রীলোক প্রতিদিন তাঁহার কাছে গৃহিণীপণা, এবং নানা প্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প শুনিতে আসিয়া থাকে। গৌরী মুখে গল্প করেন, হাতে কাজে করেন—অবসর কখনই নাই, কেবল নিদ্রার সময় মাত্র কয়েক ঘণ্টা হস্তপদ বন্ধ থাকে। সিদ্ধেশ্বরী গুণবতী বধূমাতার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া বলেন—হ্যাঁগা বেটী, এত খাটিয়া তোর একটুও কি আলস্য ধরে না?

তদুত্তরে গৌরী হাসিতে হাসিতে বলেন—মা! এ আবার খাটুনি কি, নিজের কাজ কর্চ্চি, এই বয়সে বেশী আলস্য আনিলে চলিবে কেন? গৌরীর কাজগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়!

রমণীমোহন প্রতি সপ্তাহে গৃহে আসেন, পত্নীর গৃহিণীপণা দেখিয়া এবং জননীর নিকট নিভৃতে তাহার গুণের প্রশংসা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। ঘরের হিসাব পত্র গৌরী এমন সযত্নে রক্ষা করেন, যাহার একটী পয়সাও নড়চড় হয় না। রমণীমোহন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলেন—হ্যাঁ গৌরী! মেয়ে মানুষে হাতে পয়সা পেলেই তাহার কিছু না কিছু গোলমাল করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি ত কোনদিন একটা পয়সাও গোলমাল কর না?

গৌরী স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া লাজ বিজড়িত স্বরে বলিতেন—কাহার পয়সা গোলমাল করিব? নিজের পয়সা নিজেই গোলমাল করার ফল কি? দরকার হইলে খরচ লিখিয়া রাখিলেই হইল, দরকার হয় না লিখিয়াও রাখি না। জাহানাবাদের বড় হাকিম রমণীমোহন গৌরীর এ সওয়াল জবাবের প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না, আদরে তাহার রক্তাভ গণ্ড দুই হাতে ধরিয়া তাহা সোহাগ-রঞ্জিত করিয়া পুরস্কৃত করিতেন।

যেমন পত্নী, স্বামী ও তেমন, নিষ্কর্ম্মা হইয়া কেহই বসিয়া থাকিতে পারেন না। রমণীমোহনও বাড়ী আসিয়া এক দণ্ড বসিয়া থাকেন না; সরকারের বড় চাকুরে—অনেক টাকা বেতন পান বলিয়া তাঁহার বাবুয়ানা আদৌ নাই। কার্য্যস্থলে থাকিলে একটু আদপ কায়দায় থাকিতে হয় বটে কিন্তু গৃহে আসিলে ঠিক পাড়া গাঁয়ের যুবকের মত তিনি ঘরের খুঁটীনাটী কাজকর্ম্মে নানাবিধ সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, কেবল আলস্যে নিদ্রা যাইয়া বা তাস পাসা খেলিয়া সময় নষ্ট করেন না। দিবাবসানে বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হন, পূজনীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট যাইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। রমণীমোহনের এইরূপ অমায়িক ভাব দেখিয়া পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বণিতা সুখ্যাতি করিয়া বলিত—যথার্থ শিক্ষার গুণ হরিশ মুখুজ্যের ছেলে রমণী মোহনেই ফলিয়াছে, একেই না বলে ছেলে, এরূপ ছেলের জন্মেই না বাপ মায়ের এবং বংশের মুখোজ্জল হয়? যাহাদের এরূপ গুণধর ছেলে নাই বা দুর্বৃত্ত দুই একটী পুত্রের দ্বারা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে; তাহারা মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিত—আমাদের হয়েছে "না পোয়াতির পুত, একটী বাঁদর একটী ভূত"।

দুই একদিন ছুটী পাইলে এবং গৃহে কোন কাজকর্ম্ম থাকিলে রমণীমোহন পল্লীবাসে জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে; পত্নীর সোহাগ ভালবাসায় কাটাইয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন, আরবেশী দিন ছুটী পাইলে তাঁহার চির আদরের কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন শ্বশুর বাটীতে থাকিতেন, তথাকার বন্ধু বান্ধবও অধ্যাপকগণের সহিত দেখা করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে বিস্মৃত হইতেন না। শ্বশুর বাটী আসিয়াও তিনি ঠিক জামাই-

বাবুরমত গম্ভীরভাবে বড় মানুষী চাল-চলনে দিনপাত করিতেন না। বাড়ীর মত শাশুড়ীর কাছে বসিয়া কত সুখদুঃখের কথা, কর্ম্মস্থানের কত মামলা-মোকর্দ্দমার কথা কহিয়া হাসি খেলায় দিন কাটাইয়া দিতেন। প্রভাবতীর নিকট রমণীমোহন ঠিক ছেলেটীর মত চাহিয়া খাইতেন, কোন্ দিন কি জিনিস খাইতে ইচ্ছা আছে তাহা বলিতেন। প্রভাবতীও রমণীমোহনকে জামাইয়ের মত লজ্জা করিতেন না, পেটের ছেলের মত এটা সেটা খাওয়াইতেন, বিদেশ বিভূমে থাকিবার জন্য কত সাবধান করিয়া দিতেন। অনাথনাথ প্রাণের জামাতাকে পাইলে কাজকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন, সে কয়দিন কেবল শ্বশুর জামাইয়ে বসিয়া কত গল্প গুজব করিতেন। সে প্রাণের কথা হৃদয়ের ব্যথা যেন আর ফুরায় না, শেষ হইতে চায় না। তাঁহাদের প্রাণের গৌরী এমন গুণময় হরের ঘরে অতুল আনন্দে সংসার সুখ সম্ভোগ করিতেছে, পতিপত্নী এক প্রাণ, এক আত্মা হইয়া ধর্ম্মের সংসার পাতিয়াছে, এইবার ভগবানের কৃপায় তাহাদের এই আনন্দ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের জন্য একটী দেবদূতের আবির্ভাব হইলে যেন সুখের ষোলকলা পূর্ণ হয়, পরিতৃপ্তির পূর্ণাহুতি লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন! সিদ্ধেশ্বরীরও সেই ইচ্ছা, ক্রমশঃ গণাদিন ফুরাইয়া আসিতেছে—একটী পৌত্র মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলেই যেন জীবনের সকল সাধ মিটিয়া যায়। ইঁহাদের এ আশা কবে পূর্ণ হইবে—তাহা ভগবানই জানেন, মানুষের ইচ্ছায় ত আর জাগতিক কোনকার্য্য চলে না।

দেশের বাড়ী ঘর সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। রমণীমোহন সেদিন সস্ত্রীক মহা সমারোহে গৃহ প্রবেশ করিয়াছেন। মাতৃভক্ত রমণীমোহন জননীর আদেশে একার্য্যে বিস্তর ব্যয়-বাহুল্য করিয়াছিলেন। আশ্বিন

মাসে পূজার ছুটীতে রমণীমোহন বাটী আসিয়াছেন—এসময় হিন্দু মাত্রেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করে, যাহার ক্ষমতা আছে সে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়। রমণীমোহনের গৃহ প্রবেশের সময় যাহারা খাটিয়াছিল, যজ্ঞ কার্য্যে পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহাদের কোন প্রকার মর্য্যাদা প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই। তাই তিনি একবস্তা কাপড় আনিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলেন—মা! এই পূজার সময় কাহাকে কাহাকে কাপড় দিবার ইচ্ছা করিয়াছ—দাও, আমি কাপড় আনিয়াছি। সিদ্ধেশ্বরী মনের অভিলাষানুসারে সকলকে তাহা বিতরণ করিলেন এবং বধূমাতার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট শান্তিপুরের শাটী রাখিয়া দিলেন। পাড়ার তাঁতিবউ খুব উপকারিণী, সকল কার্য্যেই সে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, তাহাকে একখানি দেওয়া হইল না, কাপড় কম পড়িল বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী একটু মনমরা হইলেন। গৌরীদেবী বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—মা! তার জন্য আর ভাবনা কেন? আপনি আমার কাপড়খানি তাহাকে দিন, বলিয়া শান্তিপুরের সেই ষোল টাকা যোড়ার কাপড়খানি তিনি অকাতরে, সানন্দচিত্তে শাশুড়ীর হাতে প্রদান করিলেন। দরিদ্রের প্রতি পত্নীর সহানুভূতি দেখিয়া রমণীমোহন আনন্দপূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া সুখের মৃদুহাসি হাসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী কাপড়খানি বধূমাতার হাত হইতে লইয়া আদরে তাঁহার মুখ চুম্বন করত বলিলেন—মা! দরিদ্র-সেবায় এইরূপ মতিগতি স্থির রাখিয়া সংসারে স্বর্গের সুখ অনুভব কর। তাঁতিবউ পূজার সময় সেই লোভনীয় উপহার প্রাপ্ত হইয়া দুই হাতে ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে গৃহে গমন করিল।

২০

প্রভাবতীর দুঃখের রজনী ভোর হইয়া জীবন কুঞ্জে সুখের সুপ্রভাত হইয়াছে। একমাত্র প্রাণের আদরিণী দুহিতা গৌরী রমণীমোহনের ন্যায় বিশুদ্ধ চরিত্র সুশিক্ষিত যুবকের হাতে পড়িয়া সুখী হইয়াছে। দরিদ্রের কন্যা আজ প্রবল প্রতাপান্বিত ডেপুটীর পত্নী, স্বামী সোহাগিনী হইয়া ধর্ম্মে ও অর্থে অতুল সুখে কাল কাটাইতেছে—ইহাতে মায়ের প্রাণে আনন্দের সীমা নাই। তাহার উপর স্ত্রীজাতির চির অকাঙ্ক্ষিত স্বামী দেবতা এতদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া এখন তাঁহারই সহবাসে কাল কাটাইতেছেন, কুলীনের ছেলে কৌলিন্য মর্য্যাদায় পদাঘাত করিয়া এখন একমাত্র তাঁহাকেই সোণার চক্ষে দেখিয়াছেন, এক দণ্ড কাছ ছাড়া না হইয়া এক খাঁচায় দুইটী পাখীর মত মুখোমুখী করিয়া কাল কাটাইতেছেন। কন্যা বিবাহের দারুণ দায়োদ্ধারের পর এ মিলনের অনন্দ বর্ণণাতীত।

অনাথ কতকগুলি স্ত্রীর পতি হইয়াছিলেন, ভর্ত্তার ন্যায় কাহাকেও ভরণ পোষণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করতঃ তাহাদের মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া যে অশেষ পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া গিয়াছে, তাই তাহাদের পরলোক গমনে প্রভাবতীর মন যোগাইতে, তাহার সাধ্য সাধনা করিয়া অনুতপ্ত জীবনে শান্তিলাভ করিতে আর এক দণ্ডও কাছ ছাড়া হন না। কেবল সকাল সন্ধ্যায় এক একবার দামুদাদার প্রদত্ত কারবারে গমন করিয়া—তাহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

কারবারের অবস্থা এখন খুব ভাল। দুই তিনটী লোক বাহাল

করিয়া অনাথ এখন মন দিয়া তাহা চালাইতেছেন, অর্থ উপার্জ্জনও বেশ হইতেছে; কিন্তু অনাথনাথের প্রাণ এখন ধর্ম্মভাবাপন্ন শুধু অর্থকেই তিনি জীবনের সার সর্ব্বস্ব মনে করেন না। সেবানন্দের কৃপায় তিনি যথার্থ কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়াছেন—সংসার পরিচালন করিয়া, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি দরিদ্র সেবায় ব্যয় করিতেন। প্রভাবতীরও অমতে অরুচি নাই, স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিতে তিনিও পশ্চাৎ পদ নন, স্ত্রী যে অর্দ্ধাঙ্গিনী, পাপ পুণ্যে যে তিনি স্বামীর সহিত সমান অধিকারিণী, তাই আপনারা মধ্যবীত্ত গৃহস্থের মত সুখে কাল কাটাইয়া, অবশিষ্ট অর্থ পরকালের জন্য সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে কাতর হইতেন না। অর্থ জমা করিয়া রাখিবার জিনিস নয়—সদ্ব্যয়ে ইহার স্বার্থকতা সম্পাদন করা মনুষ্য মাত্রেই উচিত, পিতার সময় হইতে প্রভাবতী এ সকল কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্তা, কাজেই তিনি স্বামীকে বাধা না দিয়া, আপনার ঐহিক সুখের জন্য, অলঙ্কারাদির জন্য তাঁহাকে উৎপীড়িত না করিয়া এই সকল পাবত্রিক কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

মাসী কমলমণি কাশীবাস করিয়াছেন—তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায় প্রভাবতীকেই সমস্ত দান করিয়াছেন। কাশীপুরে গঙ্গা তীরবর্ত্তী সেই বাটীতে প্রভাবতী এক্ষণে স্বামীর সহিত মনের সুখে বাস করিতেছেন।

তিনি এখন আদর্শ সংসার পাতিয়াছেন—দীন-দরিদ্র তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলে আর কষ্টের লেশমাত্র থাকে না, ঠিক মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর মত সেবা শুশ্রূষা লাভ করিয়া থাকে। এ আশ্রম ঠিক যেন

অন্নপূর্ণার আশ্রম: শিবের সহিত মা অন্নপূর্ণা যেন দরিদ্রের দুঃখ, আর্ত্তের সেবা করিবার জন্য এ আশ্রমে সদাব্রত খুলিয়াছেন। সকল প্রকারে বিড়ম্বিত, বিপদগ্রস্ত অনাথ ব্যক্তি এখানে আসিলে ঠিক পিতামাতার আশ্রয়ে সন্তানের মত আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনে শান্তি সুখানুভব করিতে পারে। প্রভাবতী ও অনাথ কখন অনাথ ছাড়া থাকিতেন না, একজন না একজন তাঁহাদের আশ্রয়ে পুত্রকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইত।

অন্ধ আতুর গৃহে আসিলে, স্ত্রীলোক হইলেএস মা; পুরুষ হইলে এস বাবা বলিয়া প্রভাবতী ও অনাথ তাহাদিগকে আদরে অভ্যর্থনা করিতেন। সকল গৃহ হইতে বিতাড়িত লাঞ্ছিত হইয়া যখন তাহারা পিতার পার্শ্বে এই মাতৃমূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইত, তখন সবিস্ময়ে দেখিত বা বুঝিত— ইঁহারা নরাকারে দেবদেবী! প্রভাবতী টকটকে চওড়া লালপাড় একখানি শাড়ি পরিয়া, সাদাসিদা মোটা একখানি ওড়নাতে সর্ব্বদাই দেহ আবৃত রাখিতেন। সধবার একমাত্র গৌরবের চিহ্ন, পবিত্র সিন্দুর বিন্দু সীমন্তের উজ্জলতা বৃদ্ধি করিত; দেবীর ন্যায় সুন্দর দেখাইতে।হিন্দুর এমন অলঙ্কার আর নাই; তাহার উপর এওতের অত্যুজ্জল চিহ্ন শাঁখা ও সোণার কয়েকগাছি চূড়ী হাতে সেই পরম রূপবতী মাতৃমূর্ত্তির৽ প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে, তাঁহাকে সাক্ষ্যাৎ দয়ার প্রতিমূর্ত্তি না বলিয়া থাকা যাইত না। আর পার্শ্বে শাক্তবীর অনাথ যখন নন্দাজনাদ্দনের পূজা করিয়া, পবিত্র গেরুয়া, বসন৽পরিয়া, নামাবলী ও রুদ্রাক্ষ মালা বিভূষিত হইয়া রক্তচন্দন চর্চ্চিত সেই সুঠাম।সৌন্দর্য্য জ্যোতিপূর্ণ দেহে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাড়াইতেন, তখন সকলকেই ঘাড় হেঁট করিয়া বলিতে হইত—

আমরা বাস্তবিকই কৈলাসে হরপার্ব্বতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

যাহারা অনাথের অধীনে কর্ম্ম করিত, তাহারাও এই আদর্শ সংসারীর সংসারধর্ম্মে, কর্ম্মযোগীর ন্যায় কর্ম্মে একান্ত আসক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। অনাথ প্রত্যহ দোকানে যাইতে না পারিলেও তাহারা নিজের কাজ মনে করিয়া প্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করতঃ রাত্রে আসিয়া সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ প্রভুর পদে সমর্পণ করিয়া মাতৃসমা প্রভাবতীর স্নেহমমতায় সমস্ত দিনের ক্লেশক্লান্তি অপনোদন করিত।

পিতামাতার সৎকার্য্যের সাহার্য্য করিবার জন্য গৌরীদেবীও স্বামীর অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া মাসহারা প্রদান করেন। রমণীমোহন চিরকালই করুণাময়ের করুণাস্মৃতি বুকে করিয়া পাঠ্যাবস্থায় কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ চাঁদা তুলিয়া অসময়ে তাহার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। একণে সময় পাইয়া আর তাহাদের সহিত এমন একটা নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? তাই স্ত্রীর হাত দিয়া তাঁহাদের মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন! অনাথনাথের সংসারে এখন কোন প্রকার অনাটন নাই, তথাপি কন্যা-জামাতার এ সাহায্য না লইলে পাছে তাহারা মনে কষ্ট পায়, এইজন্য সাদরে গ্রহণ করিতেন।

রমণীমোহন এখন জাহানাবাদে বেশ পসার জমাইয়া লইয়াছেন। সরকারী কাজে রত থাকিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত করিয়া তিনি সকলের খুব প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা মহকুমার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে দেখিয়া সরকার বাহাদুরও তাঁহাকে একজন উপযুক্ত লোক বলিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিয়াছেন।

জাহানাবাদে নির্ম্মল সলিলা দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত, তাহারই তীরে রমনীমোহনের বাসাবাটী, সরকার পক্ষ হইতে নির্ম্মিত হইলেও তিনি তাহাকে আরও একটু নিজের মত করিয়া লইয়াছেন—যাহাতে হিন্দুর মত আচার ব্যবহারে থাকা যায়। সাহেবের চাকুরী করিলেও তিনি সাহেবী ধরণে থাকিতে পারেন না, যাহার তাহার হাতে খাওয়াও তাঁহার অভ্যাস বিরুদ্ধ, তাই শাশুড়ী প্রভাবতী দেবী কুসুমপুরের রায়-গিন্নীর দ্বারা ভগীরথকে জামাতার রন্ধন কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রমণীমোহন মাকে একাকিনী দেশে রাখিয়া, কষ্টের কোলে আহুতি দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কর্ম্মস্থানের সুখভোগ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক। তিনি এখনকার ছেলে হইলেও ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান, একান্ত আত্মসর্ব্বস্ব নহেন। তাই গৌরীদেবী স্বামীর যাহাতে সুখ, যাহাতে ধর্ম্ম, যাহা তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, তাহাতেই নিজের প্রাণে বিমল সুখানুভব করিয়া দেশে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবায় কালক্ষেপ করিতেছেন।

২১

চিরদিন সুখভোগ কাহার ভাগ্যে ঘটে না। শান্তিময় অমরায় অমরগণের ভাগ্যেও যখন ভগবান সে নিয়ম প্রচলন করেন নাই, তখন কলিকলুষ পরিপূর্ণ মর্ত্ত্য-মরুর নরগণের সে আশা করা বৃথা।

সিদ্ধেশ্বরী আজীবন কষ্টভোগের পর পুত্রের দ্বারা কয়েক বৎসর

বেশ সুখে কাল কাটাইতেছেন। যেমনি ছেলে বউটীও তেমনি, তাঁহাকে অতুল সুখে রাখিয়াছেন; জীবিত থাকিয়া সংসারে এ সুখ ভোগের ইচ্ছা কাহার প্রাণে বলবতী না হয়? কিন্তু অদৃষ্টে বেশীদিন ভোগ না থাকিলে মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাহা বাড়াইতে পারে না—সিদ্ধেশ্বরীও পারিলেন না, বয়সের আধিক্য হেতু ক্রমশঃ রুগ্না হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যে জরা আসিয়া তাঁহার দেহ-বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কাজেই পত্র-পুষ্প-বিমণ্ডিত সুন্দর দেহবৃক্ষ তাহার প্রকোপে ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরীর দৈহিক বৈলক্ষণ্য দেখিয়া গৌরী বলিলেন হ্যাঁ মা! আপনি দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছেন কেন, শারীরিক কি কোনও অসুখ অনুভব করিতেছেন?

স্ত্রীলোকের অসুখ করিলে তাহারা সহজে প্রকাশ করিতে চায় না। পাছে পুত্র-কন্যা তাহা শুনিয়া বিচলিত হয়, তাহার জন্য বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এইজন্য যতদিন সম্ভব গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। হিন্দু-স্ত্রীর ইহা একচেটিয়া ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বিধবাগণের ত কথাই নাই, অসুক-বিসুক গ্রাহ্যই করেন না, সামান্য হইলেত নয়ই, বেশী হইলে বলেন—ও তেমন কিছু নয়, নাইতে খাইতে সারিয়া যাইবে, তবু প্রকাশ করিয়া কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত করিতে তাঁহারা আদৌ ইচ্ছা করেন, অথবা হিন্দুগৃহের বিধবা ব্রহ্মচারিণী মা! তোমরা সহিষ্ণুতার আধার, ধৈর্য্যের পর্ব্বত বিশেষ, সামান্য কষ্ট কি তোমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে—না তোমরা তাহাতে সামান্য স্ত্রীর মত অভিভূতা হও? হিন্দু বিধবাগণের আত্মত্যাগের এমন জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি কি জগতের আর কোন জাতির সংসারে আছে, না এমন সমুজ্জলভাবে কোথাও কোন

সংসার পবিত্র করিয়াছে ? বধূর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন —কই না, বউমা, তুমি কি বল্‌ছো, আমার ত কোন প্রকার অসুখ করে নাই—দেহ বেশ বলিষ্ঠ আছে ত ? কিন্তু আজ প্রায় একমাস হইল সিদ্ধেশ্বরীর অজীর্ণ হইয়াছে, রাত্রে একটু একটু জ্বরও হয়, গৌরীদেবী এ কয়দিন শাশুরীর কাছে শয়ন করেন নাই বলিয়া কিছু বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন—না মা, তুমি যতই বল, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে, আমাদের কষ্ট হবার ভয়ে তুমি মান্‌ছো না ?

"নাগো বেটী না"তুইও তেমনি ছেলে মানুষ দেখ্‌ছি, মুখে রুচি থাক্‌লে কি আবার অসুখ হয়। সিদ্ধেশ্বরী ঐ সামান্য একটু জ্বরও অজীর্ণকে তত মারাত্মক বলিয়া বিবেচনাই করেন না। নাইতে খাইতে সারিয়া যাইবে, উহার জন্য আবার বউবেটার নিকট প্রকাশ করিব কি ? এ দেহের আবার সুখ শোয়াস্তি কেন ? হিন্দু বিধবার অপরিসীম সহ্যগুণে সামান্য জ্বরাব্যাধি দেহে আশ্রয় করিলে তাঁহারা অনুভবের মধ্যেই আনেননা।

আজ রাত্রে আহারাদির পর শাশুড়ী-বধূ এক বিছানায় শয়ন করিলেন। সিদ্ধেশ্বরীও ত ঐ চান, রমণী যখন ঘরে নাই, তখন আর আলাহিদা বিছানা কেন ? কোলের মেয়েটীর মত গৌরী তাঁহার কাছে শুইয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। গায়ে পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—তাহা স্বাভাবিক নহে, যেন একটু একটু গরম হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অধিক রাত্রে বোধ হয় আরও বেশী হইবে। সিদ্ধেশ্বরী ঘুমাইয়া পড়িলেন, গৌরীদেবী কিন্তু বিনিদ্র নয়নে শাশুড়ীর কোলের কাছে শুইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রী দ্বিতীয় প্রহরের পর গাত্রের উত্তাপ অতিশয় বাড়িয়া উঠিল, রোগী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গেলে, তিনি যেমন জল খাইতে উঠিবেন, অমনি গৌরী ধরিয়া বলিলেন—কেন মা! জল খাবেন কি?

হাঁ মা, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, একটু জল দাও বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া বসিলেন। গৌরীদেবী এক গেলাস শীতল জল শাশুড়ীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন—মা! এই রকম কতদিন হচ্ছে, তাতো তুমি একদিনের জন্যও বলো নাই—ওঃ করেছ কি, একি জ্বর, গা যে পুড়ে যাচ্ছে?

ও আর কি মা; আমাদের অমন হয়, এ শরীরে আবার এত মায়া মমতা কেন? অনেক দিন এসেছি, এখন যেতে পারলেই বাঁচি! বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিলেন কিন্তু তাহা হইল না, অজীর্ণ হেতু পেট ফাঁপিয়া উঠিয়া একবার দমকা ভেদ হইয়া গেল। প্রত্যহই এইরূপ হয়, আজ গৌরী তাহা, স্বচক্ষে দেখিয়া ভাবিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—তুমি যাই বলো মা! আমি কিন্তু কালই চিঠি লিখে তাঁকে জানাবো, আসিতে বলিব—এর ত একটা চিকিৎসা করা উচিত! সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—না মা, আর পত্র লিখে বাছার আমার উৎকণ্ঠা বাড়াবে কেন; সেত শনিবার বাড়ী আসবে, তখন না হয় বলো?

গৌরী।—না মা, শনিবার এখনও অনেক দেরী—আজ যাহা দেখলাম। এতো তাঁকে না জানিয়ে থাকতে পারা যায় না, তুমি করেছো কি? এতদিন চেপে চেপে রেখে রোগটাকে বাড়িয়ে ফেলেছো, আর আমিও

হতভাগী যদি কাছে শুতাম, তাহলেও আর তুমি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারতে না?

সিদ্ধেশ্বরী।—মা, তোমার দোষ কি, এই গ্রীষ্মে এক বিছানায় দুইজনে শুয়ে ঘুম হয় না বলেই ত তোমাকে অন্য বিছানা কর্ত্তে বোল্‌তুম, এতে তুমি দুঃখ কর কেন?

গৌরী বলিলেন—মা! যাই হউক, কাল রাখালকে দিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাই, আর তাঁকে একটা পত্র লিখে দিই, এক এক শনিবার কাজকর্ম্ম থাক্‌লে তিনিত বাড়ী আসেন না, এ শনিবারে যেন তা না করেন, সহস্র কাজকর্ম্ম ফেলেও যেন বাড়ী আসেন!

পুত্র প্রবাস হইতে বাড়ী আসিবে—পুত্রগতপ্রাণা মায়ের তাহাতে অমত কোথায়? কিন্তু যদি রমণী না আসে, তাহলে চিঠি লিখে দেওয়াই ভাল। তবে বলিয়া দিলেন—বউ মা! আমার অসুখের কথা বেশী করে লিখো না, তাহলে সে ভেবেই আকুল হবে, সমস্ত ফেলেঝেলে চলে আস্‌বে; সরকারী কাজে হয়ত গলদ হয়ে যাবে, সে মা-পাগলা ছেলে জানত? তবে লিখ্‌তে হয়—একটু লিখো, তারপর বরং বাড়ীতে এলে যা বল্‌তে হয় বলো!

শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া গৌরীর প্রাণ খারাপ হইয়া গিয়াছে তিনি প্রাতঃকালে সকল কর্ম্ম ফেলিয়া রাখালকে কবিরাজ বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং কাপড় চোপড় ছাড়িয়া অগ্রে স্বামীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে "মায়ের পেটের ভয়ানক পীড়া হইয়াছে, হাজার কাজ থাকিলেও আপনি এ শনিবারে বাড়ী আসিতে ভুলিবেন না।"

২২

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" যৌবনে ধনও বিদ্যার্জ্জনে অজর-অমর মনে করিয়া মানুষকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় নতুবা সে বিদ্যা, কিম্বা ধন সঞ্চয় করিতে পারে না, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারপর জীবনের এই সকল কাম্যবস্তু লাভ হইলে, "গৃহীত্বা এব কেশেষু মৃত্যুণাধর্ম্মমাচরেৎ" বৃদ্ধাবস্থায় এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা করিয়া পরকালের পথ মুক্ত করিতে হয়। তবে ধর্ম্মভাবটা বাল্যকাল হইতেই মনে মনে বদ্ধমূল থাকা চাই, নতুবা বৃদ্ধ বয়সে একবারে আন্‌কোরা নূতন হইলে ধর্ম্মোপার্জ্জনের আশা করা যায় না।

রমণীমোহন সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু মনে প্রাণে বদ্ধমূল আছে—অধর্ম্মে কখনও ধন সঞ্চয় করিব না এবং যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহার কিঞ্চিৎ পরার্থে ব্যয় করিব নতুবা উপার্জ্জনের সার্থকতা কোথায়? এই জন্য একটা না একটা পরহিত ব্রতে তিনি কিছু কিছু ধনের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন!

জাহানাবাদে আসিয়া অবধি তিনি কার্য্যে কখনও অবসর গ্রহণ করেন নাই! রবিবার এবং উৎসবাদিতে যে ছুটীর নিয়ম আছে, কেবল সেইছুটীই উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাবধি সরকারী ছুটী তিনি একবারও গ্রহণ করেন নাই, অক্লান্তভাবে আজ তিন চারি বৎসর সরকারী কার্য্যে সমভাবেই যাপন করিতেছেন কিন্তু এইবার কিছুদিন ছুটী লইয়া বাটীর বন্দোবস্ত না করিলে নয়। ঘরবাড়ীগুলি নূতন করিয়া

তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার ছন্দবন্দ করিয়া একবার জননীর পদতলে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া মনোরমা পত্নীর সহিত প্রাণের আদান প্রদান করিতে তাহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনের পদধূলি লইতেও তাঁহার বড় সাধ, তাই কিছু দিন ছুটি পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন— বিগতকল্য সেই ছুটী মঞ্জুরও হইয়া আসিয়াছে। তাই বাড়ী আসিবার জন্য প্রাণ উৎফুল্ল—মন উৎসাহে ভরা; আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু লইবার জন্য তিনি অধীনস্থ জনগণকে বলিয়াছেন, তাহারা সংগ্রহ করিতেছে। রমণীমোহন আজ আদালতে আসিয়া হরিহরপুরের জমীদার প্রভাস মুখুর্জ্জের মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ করিলেন। পাঠক! কুসুমপুরের প্রথম মুখুর্জ্জের পুত্র প্রভাসের সহিত গৌরীর বিবাহের সময় হইতে আপনারা পরিচিত, প্রভাবতী প্রভাসের সহিত গৌরীর বিবাহ দিতে অস্বীকৃতা হওয়ায় প্রমথ বাবু হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রভাবতীকে কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছিলেন, গৌরীর বিবাহে কিরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত করিয়াছিলেন—তাহা কাহারও অবিদিত নাই; রমণীমোহন না থাকিলে বোধ হয় সে রাত্রে গৌরীর বিবাহই হইত না। সেই রমণীমোহন আজ ভগবানের কৃপায় জাহানাবাদের হাকিম হইয়াছেন।

পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়, এ বাক্যের সার্থকতা পদে পদে। তাই অদ্যাবধি প্রভাসের বিবাহ হয় নাই, এত বড় জমীদার হইলেও কেহ তাহাকে কন্যাদান করে নাই, সে গৌরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াও হতাশ হইল, বহু দূর দেশ হইতে তাহার একজন দুস্থ সহাধ্যায়ী, কলেজের ভাল ছেলে তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল, এ অপমান কি রাখিবার স্থান আছে? তাই যেমন করিয়া

হউক প্রভাস গৌরীকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রও নষ্ট করিল, ইয়ার বক্সী লইয়া নেশার মাত্রা বাড়াইয়া দিল, বোম্বেটে হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, পিতামাতার হাপদাপ মানিল না।

হাজার পয়সা থাকুক জানিয়া শুনিয়া চরিত্রহীন যুবককে কেহ কন্যাদান করিতে চাহে না। এই জন্য অপর স্থান হইতে যত সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, প্রভাসের গুণের কথা শুনিয়া সকলেই ভাগিয়া গেল, কেহই আর কন্যাদানে সম্মত হইল না। প্রভাস বড় লোকের ছেলে, অর্থ অজস্র আছে, এ অবস্থায় তাহার প্রকৃতি উদ্দাম ভাবে গঠিত হইলে, তাহা কিরূপ ভয়ের কারণ হয়, পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। পিতামাতা পুত্রকে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন, স্ববশে রাখিয়া বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু যাহার চরিত্র একবার বিগ্‌ড়াইয়াছে; নিজে বিবেক ও বুদ্ধিবল হারাইয়াছে, কেবল কথায় বা উপদেশে তাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় না।

প্রভাস বোম্বেটেগিরি করিয়া দুই একবার রাজদ্বারে দণ্ডিত হইল, দেখিয়া প্রমথনাথ আর লজ্জায় কাহার নিকট মুখ দেখাইতে পারিলেন না। শেষে দুর্জ্জয় অভিমানে এবং মনের দুঃখে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, কয়েক দিন মাত্র বিষম জ্বরের প্রলাপ প্রকোপে পুত্র পুত্র করিয়া তিনি একদিন জীবলীলান্তে পুন্নাম নরকের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন কি না তাহা ভগবানই জানেন। সাধ্বী সতী প্রমথনাথের স্ত্রী, স্বামীর অপরিমিত শোকে মরমে মরিয়া কিছুদিন পরে মাণের কোলে জুড়াইলেন। মূর্খ পুত্র যমোপম, তাহার অত্যাচার,

অবিচার এবং দুর্নাম শুনিয়া বেশীদিন তাঁহাকে জলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইল না।

পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রভাস কি জানি কেন একটু নরম হইয়া গেল। পাড়ার লোক প্রমথনাথের খাতির করিত, অনেক বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপকৃত ছিল বলিয়া প্রভাসের অত্যাচার অসহ্য হইলেও সহ্য করিত কিন্তু এখন আর তাহা সহ্য করিবে কেন? সকলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কড়া মেজাজে বলিল—আর হতভাগাকে আস্কারা দিলে চলিবে না। সে যেমনি অত্যাচার করিবে সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা কর, পাড়া ঐক্য হইলে তাহার সাধ্য কি এখানে বদমায়েসী করে? প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল, দেখিয়া প্রভাস একটু দমিয়া গেল; পিতামাতার মৃত্যুতে হৃদয়ে একটু বিবেক ভাব জাগিয়াই হউক, বা ভয় প্রযুক্ত হউক বাটীর বাহিরে আসিয়া গুণ্ডামী করিতে আর সে সাহস করিল না।

প্রমথ বাবু জীবিত থাকিতে প্রভাসের বিবাহের চেষ্টা হইত কিন্তু এখন প্রভাসকে আর কেহ বিবাহ দিতে সম্মত হইল না। কন্যার পিতামাতা তাহার এত ধনদৌলত দেখিয়াও ভুলিল না। ভিন্নস্থান হইতে যে সকল সম্বন্ধ আসিতে লাগিল—পাড়ার লোকে তাহাও ভাঙ্গিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কাজেই বিবাহ আর হইবে কেমন করিয়া? কন্যা বোলে ত জলে ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে? যত দিন যাইতে লাগিল, বিবাহ হইবার পক্ষে তত অন্তরায় সংঘটিত হইতে, প্রভাসের মনে গৌরীর গরিমাময়ী মূর্ত্তি অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

জাহানাবাদের হরিহরপুর প্রমথনাথের বড় জমিদারী, প্রভাস পিতার মৃত্যুর পর খুব ভাল মানুষ সাজিয়া রমণীর সহিত সহপাঠী হিসাবে সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য; গৌরী বোধ হয় স্বামীর সহিত কর্ম্ম স্থানে গিয়াছে, তাহার হাবভাব দেখিয়া বহুদিনের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য হরিহরপুরে আসিয়া প্রজাদের উপর কড়াকড়ি আরম্ভ করিল, কিন্তু হরিহর-পুরের প্রজারা তত নিরীহ নহে যে জমীদারের অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিবে. তাহারাও জমীদারের উপর চাল চালিতে জানে, তাই গৃহদাহ ও মারপীটের বৃথা মোকর্দ্দমা সাজাইয়া তাহারা হরিহরপুরের মহকুমা আদালত জাহানাবাদে নালিশ রুজু করিয়াছে এবং সে মোকর্দ্দমা আজ কিছু দিন হইল রমণীমোহনের এজালাসেই হইতেছিল।

২৩

রমণীমোহন আদালতে আসিবা মাত্রই আরদালী তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল। তিনি পত্রের হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন—এ গৌরীর পত্র। তিনি তাহার আবরণ ছিন্ন করিয়া যাহা পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল. জননী ভয়ানকরূপে পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন; পত্র পাঠমাত্র বাড়ীতে আসিবেন। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন।

মাতৃভক্ত রমণীমোহন আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এর মধ্যে মায়ের এমন কি পীড়া হইল যে কবিরাজ মহাশয় ভয় পাইলেন? আমি এই সপ্তাহ মাত্র বাড়ী যাই নাই। হরিহরপুরের মোকর্দ্দমার গুরুত্বান

পরিদর্শন জন্য মোটে একটী সপ্তাহ অনুপস্থিত—ইহার মধ্যে এমন শক্ত পীড়া, তবে কি ভিতরে ভিতরে বিপদ ঘনীভূত হইতেছিল, আমাদের চিন্তার কারণ হইবে বলিয়া মা তাহা প্রকাশ করেন নাই? বাঙ্গালীর বাড়ীর মেয়েগুলোর দশাই এই—একেবারে খুব বেশী হয়ে না পড়লে আর সহজে আপনাদের অসুখের কথা প্রকাশ কর্ত্তে চায় না—এই জন্য অতিরিক্ত কষ্ট পায়—চিকিৎসায়ও সহজে কোন ফল হয় না। আমি যখন বাড়ীতে ছিলাম, মারত কোনও অসুখই দেখি নাই! নিশ্চয়ই তিনি গোপন করেছিলেন, গৌরী তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে। কবিরাজত দেখাইতেছে কিন্তু গ্রাম্য কবিরাজ সে কঠিন পীড়ার কি বুঝিবে? পত্রের যেরূপ ভাব দেখিতেছি—তাহাতে পীড়া খুবই শক্ত।

কাজকর্ম্মে মন লাগিল না—প্রাণের তারে টান পড়িয়াছে; জগতের সার সর্ব্বস্ব, আরাধ্যা-দেবী, জননী কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা, সন্তানের মস্তিষ্ক কি চিন্তাহীন অবিকৃত থাকিতে পারে? তাই মাথা গুলাইয়া গেল, নূতন মোকর্দ্দমা আর কিছু ধরিলেন না। হরিহরপুরের মোকর্দ্দমায় প্রভাস-বাবুর পক্ষের প্রত্যেকের দশ দশ টাকা জরিমানার রায় বাহাল করিয়া তিনি সে দিনকার মত আদালত বন্ধ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছিল। তাঁহার বদলী যে বিচারক আসিয়াছিলেন, রমণীমোহন তাঁহাকে সমস্ত চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া বাসায় আসিলেন। ভগীর মাকে পত্রের যাবতীয় মর্ম্ম অবগত করাইয়া বাড়ী রওনা হইবার জন্য সমস্ত গুছাইতে বলিলেন। যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া দেশে আনিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর আনা

হইল না, তবে যাহা সম্মুখে আসিল—ভগীর মাকে তাহাও সাম্‌লাইয়া লইতে বলিলেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় জাহানাবাদ হইতে চব্বিশ পরগণার রুদ্রপুরে আগমন করা সহজ-সাধ্য ছিল না। তখন এত যানবাহনের প্রচলন হয় নাই, পথে দস্যু ভয়ও যথেষ্ট ছিল। রমণীমোহন মনে করিলেন—পদব্রজে একাকী চলিয়া যাই; আবার মনে করিলেন—ভগীর মাকে কোথায় রাখিয়া যাইব? একাকিনী ভদ্রবংশের স্ত্রীলোককে এখানে রাখিয়া যাওয়া উচিত নয়। কাজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমার এখন একমাস ছুটী হইয়াছে, ঘরে মায়ের অসুখ, কবে আসিব—তাহারও ত স্থিরতা নাই!

সন্ধ্যাকালেই রওনা হইবার উপক্রম করিয়া রমণীমোহন উমেশ ভাড়ারীকে গাড়ী আনিতে বলিয়া দিলেন কিন্তু ভাড়ারী বলিল—দাদাঠাকুর! আজ ভর সন্ধ্যে বেলা আব কেন, সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া যদিও আপনার মায়ের অসুখে প্রাণ যাক আর থাক্ আমি যেতে পারি কিন্তু অবলা পশু দুইটী ত সে কথা বুঝবে না, তাহারা কিছুদূর গিয়েই হয়ত শুইয়া পড়িবে, তখন হিতে বিপরীত হইবে, তাই বল্‌ছি—ভগবানে বিশ্বাস করে এই ঘণ্টা কয়েক একরকমে কাটাইয়া দিন।—রমণীও বুঝিলেন, আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়াই কাটিয়া গেল, একটীবারও চক্ষে-পাতায় হইল না। রমণীমোহন যে মা অন্তপ্রাণ, ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার হিন্দুয়ানীর কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই:

মা যে জগতের সার; এ কথা তিনি ইংরাজী শিক্ষার মহিমায় মন থেকে তাড়াইয়া দিতে পারেন নাই। এখনও তিনি প্রতি সপ্তাহে বাড়ী আসিয়া ছোট ছেলেটীর মত রাত দুপুরে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া ছেলেবেলার মত তাঁর মুখে সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা, সেই তাড়কা রাক্ষসীর কথা, সেই মহীরাবণের বেটা অহিরাবণের প্রাণজুড়ান গল্প শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়েন; পুত্র ঘুমাইয়া পড়িলে কত ডাকাডাকি করিয়া মাতা তাহাকে বধূর ঘরে তুলিয়া দেন। সিদ্ধেশ্বরী যত বলেন—হাঁরে রমণী! তুই অত লেখাপড়া শিখেছিস্, কতবার রামায়ণ, মহাভারত পড়েছিস, তবু তোর ছেলেমানুসী গেল না; এখনও ছেলেবেলার মত আমার কাছে তোর গল্প শুনতে ভাল লাগে?

রমণী বলিলেন—মা! ও চিরদিনই ভাল লাগ্‌বে। তুমি মা, আমি ছেলে—হাজার পণ্ডিত হলেও তবু তোমার কাছে বড় হতে পার্ব্বো না, বাপমায়ের কাছে ছেলে যত পণ্ডিত হউক, কখনও বড় হতে পারে না, তোমাদের বড় যে ঈশ্বরদত্ত, আমি দিগ্বিজয়ী হলেও তোমার কাছে কিছুই নয়। তোমার ঐ ছেলে ঘুম পাড়ানার ছলে মধুর স্বরে গল্প বলা, তাহার তুলনা আমি খুঁজিয়া পাই না। তাই সপ্তাহে সপ্তাহে তোমার কোলে জুড়াইবার জন্য বাড়ী আসি?

এহেন মাতৃভক্ত রমণী মায়ের কঠিন পীড়া শুনিয়া কেমন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন—তাহা সহজেই বিবেচ্য। প্রাতে উঠিয়াই রমণী-মোহন তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া লইলেন; ভগীরমাকে কতকগুলি জিনিসপত্রসহ গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আপনি উমেশ পাইককে লইয়া পদব্রজে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন।

এখানে আসিয়া অবধি এই বাগ্দী পাইকটী তাঁহার গোলামী করিত। রমণীমোহনের দ্বারা তাহার দিন গুজরান হইত বলিয়া উমেশ রমণীকে বড় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। রমণীমোহনের রুদ্রপুরের বাটীতেও সে অনেক বার আসিয়া পথঘাট জানিয়া শুনিয়া লইয়াছিল। কাজেই তাহাকে সঙ্গে লইতে হইল।

উমেশের হাপাজাতে ভগীর মা ও দ্রব্যাদির ভার দিয়া রমণীমোহন বলিলেন—উমেশ কা! তুমি এই সমস্ত লইয়া অগ্রে বাড়ী যাও, আমি একজন ভাল কবিরাজ লইয়া পশ্চাত যাইতেছি। সিদ্ধেশ্বরী জীবনে কখনও ঔষধ খান্ নাই। ডাক্তারী ত নয়ই, তবে কবিরাজের বড়িজাড়ী অনেক সাধ্যসাধনা করিলে, রমণী অনেক বলিলে কহিলে না খাইয়া থাকিতে পারেন না। তাই এ সময় একজন বিজ্ঞ কবিরাজ সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত, গ্রামে ত ভাল কবিরাজ নাই?

তখন কলিকাতায় রামনাথ সেনের নাম ডাক খুব বেশী, তাঁহাকেই সঙ্গে করিয়া লইয়া রমণীমোহন বেলা তিনটার সময় বাড়ী পৌছিলেন। ভগীর মা ও উমেশ পূর্ব্বেই আসিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে। বৃদ্ধা সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যুকে তত ভয় নয়, যত ভয় পুত্রের সহিত শেষ দেখা না হইলে। তিনি কেবল মধুসূদনকে ডাকিতেছেন—ঠাকুর! আমি এখন বেশ সুখে মরিতে পারিব, তবে রমণীকে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখে মরতে .পারি। এখন তিনি কেবল পুত্রের জন্য উতলা হইয়াছেন—মৃত্যুর জন্য নহে।

রমণী যখন কবিরাজের সহিত গৃহ প্রবেশ করিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিলেন—মা! কেমন আছ মা! এই যে আমি এসেছি! বৃদ্ধা

চক্ষু মুদিয়া ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, ছেলের প্রাণ জুড়ান ডাক হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিবামাত্র তিনি ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া, সেই জীর্ণ শীর্ণ হাত দুখানি কাঁপাইতে কাঁপাইতে বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ডাকিলেন। রমণী বালকের মত হাপুশ নয়নে কাঁদিয়া বলিলেন—মা! এই সে দিন যে তোমাকে ভাল দেখে গেলাম, আর এই কয় দিনে কেমন করে তোমার এমন হলো মা! সিদ্ধেশ্বরী জড়িতস্বরে বলিলেন—বাবা! যাদের কালের ডাক পড়ে, তাদের এম্নিই হয়, তা বাবা! ভাবনা কি? আমি যে তোর মা হয়ে মরছি, এর চেয়ে ভাগ্য আর কি আছে—সাতটা নয় পাঁচটা নয়, একটা ছেলে, এখন তোমায় রেখে যাওয়াই ত আমার ভাগ্য। শ্বশুরের বংশ উজ্জ্বল করে দিয়ে, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণের সুখে কর্ত্তার কাছে চলে যাচ্ছি, এর তুল্য সুখ আর কি আছে বাবা? রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—কোথা যাবে মা, এই যে কবিরাজ মহাশয় কলকাতা থেকে এসেছেন; রোগ ভাল করে দেবেন। অবোধ ছেলে কতকগুলো টাকা বৃথা অপব্যয় করলে দেখে বৃদ্ধা মনে মনে একটু কষ্ট পেলেন কিন্তু ছেলে তার কর্ত্তব্য কর্ত্তে ছাড়বে কেন? মনে করিয়া ধীরে ধীরে কবিরাজকে হাত দেখাইলেন। সেন মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার হাবভাব দেখিলেন, ঔষধাদিও ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু দর্শনী লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় পাড়ার দুই একজন মাতব্বরকে বলিয়া গেলেন—রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়াছে, আর আশা নাই, বোধ হয় অদ্য রাত্রে, না হয় কল্য দ্বিতীয় প্রহরে মৃত্যু অনিবার্য্য; তবে এ কথা এখন প্রকাশ করা ভাল নয়, কারণ রোগিনী পরম ধার্ম্মিকা, তাহার অন্য কোন উপসর্গ হইবে না, হাসিতে হাসিতে তাঁহার চক্ষু স্থির

হইয়া যাইবে ! এ অশুভ সংবাদ কেহ রমণীর নিকট প্রকাশ করিল না।

গৌরী বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। জননীসমা শাশুড়ী দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিনের সামান্য জ্বরে একি হইয়া গেলেন ? তিনি একাকিনী স্ত্রীলোক কি করিবেন, তাই স্বামীর আগমনে এবং সঙ্গে একজন বৃদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিরাজের আগমনে কতকটা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর যেন ধড়ফড় করিতে লাগিল, একটা ভয়ানক বিপদ পাতের পূর্ব্বে প্রাণ যেমন বিষাদভারে ভরিয়া উঠে—ইহাও তেমনি। গৌরী স্বামীকে পীড়ার বিষয় সমস্ত একে একে বিবৃত করিয়া বলিলেন— আমরা জানিতে পারি নাই এবং তিনিও এমন গোপনে রেখেছিলেন যে সহজে কেহ জানিতে না পারে। যখন প্রকাশ হইল—তখন রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে ; তবে তুমি যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছো এই ভাল, নইলে আমি কিছুতেই মাকে বুঝাইতে পারিতেছিলাম না।

রমণীর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, তিনি সংসার অন্ধকার দেখিতেছেন। মাই যে তাঁহার সব, তাঁহারই কৃপায় যে রমণীর এত উন্নতি ; সামান্য দিন মাত্র তিনি চিরদুঃখিনী মাকে আশা মিটাইয়া না হউক, একটু একটু করিয়া সুখী করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে জগদীশ ! এ কি করিলে ? আশা মিটিতে না মিটিতে জগতের আরাধ্য বস্তু জননীকে সরাইয়া লইলে ? রমণী বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লাল করিয়া ফেলিলেন। গৌরীত আজ দুই তিন দিন রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন ; আর শাশুড়ীর কেবল বকুনী খাইয়াছেন—হ্যাঁ বউ মা ! তুমি কি তবে আমার যাবার পথ বন্ধ কর্ত্তে

চাও; এ কি কখন হয়? গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন—মা! তা নয়—তবে দেখিতে দেখিতে এমন হয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী। যা হয় তা এমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই হয়, আর তাই ভাল নতুবা ভুগিয়া আর সকলকে ভোগাইয়া মরা ভাল নয়! মরতে যখন হবে, তখন তোমাদের সুখ দেখে মর্ত্তে পারলেই আমার মরণেও সুখ! তুমি কেঁদোনা মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী কেঁদ না। এমন মধুমাখা বোল গৌরী জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন না, তাই তিনি প্রাণের মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন।

রমণীমোহন আসিয়া অবধি আর মায়ের কাছ ছাড়া হন নাই, আহার নিদ্রা তাঁহার ত্যাগ হইয়াছে। ভগীর মা সংসারের অবস্থা দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না; গৌরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রন্ধন-শালায় গমন করিয়া যৎসামান্য আহারের আয়োজন করিল। পেটত বুঝিবে না, সম্পদে-বিপদে শোকে-দুঃখে তারত নিবৃত্তি নাই! বরং বেশী শোক-দুঃখে জঠরানল আরও বেশী জ্বলিয়া উঠে। গৌরী যখন দেখিলেন—ভগীর মা! রন্ধনের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে, তখন অতি কষ্টে সমস্ত বাহির করিয়া দিলে—ভগীর মা, রান্না চড়াইল, তাহাদের যাই হউক, ভগীর মা, উমেশ কাকা, এবং রাখালেরত খাওয়া চাই!

সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে কোলে পাইয়া যেন অন্যদিন অপেক্ষা আজ বেশ হালুচালু করিতেছেন, রোগ যেন অনেকটা সারিয়া গিয়াছে। পুত্র মায়ের সেই কঙ্কালসার দেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে, শরীর কান্তি বিমলিন। মা চিরকালই মা! ছেলের কষ্ট তাঁহার চিরদিনই অসহ্য, তাই মরিতে যাইতেছেন, তথাপি বলিতেছেন—বাবা! মুখ হাত ধুইয়া

কিছু খা-দা ; কেবল কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ লাল করিলে কি হবে? যেমনি বউ, তেমনি ছেলে—বুঝালে বুঝে না!

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—মা। খাবার ত তুমি দাও তবে খাই—ঘরে এসে ত আমি কারু হাতে খাই না।

বৃদ্ধা ছেলের ছেলেমানুষী জানেন, মাতৃভক্ত পুত্রের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার চক্ষে আর জল থাকিল না, সেই কোটরগত চক্ষু উপচিয়া নেত্রনীর বক্ষে পড়িল। রমণীমোহন দেখিলেন—মাকে এসময় আর কাঁদান উচিত নয়, ছেলেবেলায় কত কষ্ট দিয়াছি, এখনও কি তাই? মায়ের চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন—মা! রান্না হউক না, আমি তোমার কাছে বসেই খাবো এখন?

বৃদ্ধা বলিলেন—বউমা কি বান্না ঘরে আছেন?

রমণী বলিলেন—না মা! ভগীর মাকে যে সঙ্গে এনেছি, তাকে সেখানে কোথায় রেখে আস্‌বো, আমার যে একমাস ছুটী!

ভগীর মা আসিয়াছে, ছেলে একমাস ছুটী পাইয়াছে শুনিয়া বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—তা ভাল, কাজকর্ম্ম সারা হইলে ভগীর মাকে একবার আস্‌তে বলিস্, আমি তাকে অনেক কথা বলে দিব!

"আচ্ছা মা!" বলিয়া রমণীমোহন ঔষধ দিবার জন্য গৌরীকে ডাকিলেন। গৌরী তাড়াতাড়ি আসিয়া ঔষধ মাড়িয়া শাশুড়ীর পাণ্ডুর বদনে ঢালিয়া দিলেন।

সেদিন সমস্ত রাত্রদিন একপ্রকার বেশ কাটিল, সিদ্ধেশ্বরী ভগীরমাকে কত বুঝাইলেন, বলিলেন—তোর হাতে আমার প্রাণ স'পে দিয়েছি মা! তুই তাকে দেখিস্, বলে কত কাকুতি মিনতি করিলেন। ভগীর মা তাঁর

কথায় সায় দিয়া বলিলেন—মা ! কোন ভাবনা নেই, আমি বাবুকে ছেলের মত দেখি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার দ্বারা কোন কষ্ট হবে না ; আমিও ছেলের মা ; প্রাণ দিয়ে তোমার রমণীর স্বাস্থ্য ভাল রাখ্‌তে চেষ্টা কর্বো। এইরূপ কথায় বার্ত্তায় রজনী বেশ কাটিয়া গেল কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি হইল। অকস্মাৎ একটা ভীষণ শ্লেষ্মা আসিয়া রোগিণীর বুকে চাপিয়া বসিল, তাহাতেই বাক্যরোধ হইয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন—আর বেশীক্ষণ নয়, তিনি সমস্ত মায়াজাল কাটাইয়া জীবনের শেষ হিসাব নিকাশ করিতে বসিলেন, দেখিলেন—পাওনা অপেক্ষা দেনাই বেশী ; আজ সব শেষ করে রাজদ্বারে গিয়া দাঁড়াতে হবে, শ্রীগুরু তুমিই ভরসা ! বৃদ্ধা আর কথা কহিলেন না, একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সেই শেষ নিশ্বাস বায়ুস্তরে মিশিয়া গেল, চক্ষু মুদ্রিত হইল, আর খুলিল না।

সিদ্ধেশ্বরী সকলকে কাঁদাইয়া, পুত্র ও পুত্রবধূকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গবাসে চলিয়া গেলেন। কোন বাধাই মানিলেন না, পুত্রের এত আকুলি বিকুলি ক্রন্দন, বধূর এত প্রাণ ফাটা চীৎকার কিছুতেই তাঁহাকে এ মহাযাত্রা হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। যাহাদের তিলমাত্র কষ্ট দেখিলে সিদ্ধেশ্বরী আকুল হইতেন, আজ তাহাদের এ ভীষণ আর্ত্তনাদ তাহার সে গতিরোধ করিতে পারিল না। যখন যার ডাক পড়ে, তখন তাকে হাজার আগ্‌লে রাখবার চেষ্টা করলেও রাখ্‌তে পারা যায় না। মায়ার বাঁধনে যত তাকে বাধতে চেষ্টা কর, সে শিকল কাটা পাখীর মত ফুস্‌ করে কখন সরে পড়বে, কেউ দেখ্‌তে পাবে না। হইলও তাই, মাতা পুত্রে এই যে কত কথা হইতেছিলেন, মা ভাল

আছেন বলিয়া রমণীর প্রাণ কত আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, পরক্ষণেই একি ? আর কথা নাই—সব শেষ—শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গিয়াছে !

জননীর মৃত্যুতে জননীগত প্রাণ রমণীর ও তদীয় পত্নী গৌরীর অবস্থা লিখিয়া বুঝান যায় না। তাঁহারা স্বামীস্ত্রীতে যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলার স্বর বদ্ধহইয়া গিয়াছে—ডাকিলে কষ্টে উত্তর দেন কিন্তু কেহ শুনিতে পায় না, চক্ষু জলে ভরিয়াই আছে, সে ভাস্বর চাহনিতে যেন দৃষ্টিশক্তি নাই, জীয়ন্তে মরার মত জবুথবু হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসীরা অবস্থা দেখিয়া শব স্থানান্তরিত করিল, দেখিয়া গৌরী বুক চাপড়াইতে লাগিলেন, স্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কান্না বাহির হইতেছে না! রমণী অবোল হইয়া তাহাদের পাছু পাছু না যাইলে নয়, তাই শ্মশানে সংকার করিতে চলিলেন, পা উঠে না, জড়াইয়া পড়িতেছে, তথাপি পরের পায়ে চলার মত উঠি-পড়ি করিয়া কি করিবেন —যাইতে হইল।

২৪

মাতৃ বিয়োগের পর রমণীমোহন একরকম হইয়া গেলেন। যে অনাবিল স্নেহ-মমতা তাহাকে এতদিন পরমানন্দ দান করিয়াছিল, যাহার স্নেহছায়ায় থাকিয়া তিনি একদিনের জন্য কষ্ট বলিয়া কোন জিনিষ জানিতেন না, আজ তাঁহার সেই আনন্দ নদীর মমতার-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া শোকের প্রবল উচ্ছাসে চারিদিক অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল। রমণীমোহনের মন একবারে দমিয়া গেল, তথাপি পাড়ার সকলের

সান্ত্বনায়, শাশুড়ী শশুরের প্রবোধ বাক্যে তিনি এক প্রকার আশ্বস্ত হইয়া জননীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অত্যধিক শোকে মুহ্যমান হইলেও জননীর পারত্রিক কার্য্যে তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করিলেন না। পাড়ার প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য যেরূপ উপদেশ দিলেন, রমণী সেইরূপ ব্যয়-বাহুল্য করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

মা ত আর হবে না; তবে তাঁর পারলৌকিক উন্নতির জন্য তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত পুত্র কৃপণতা করিবে কেন? যখন অর্থ আছে, তখন সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হওয়াই ত প্রার্থনীয়। শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করিয়াই সম্পন্ন হইল। তিনচারি খানি গ্রামের ব্রাহ্মণ-শুদ্র ভোজন, অধ্যাপক ও কাঙ্গালী বিদায়ের সহিত বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইলে রমণীমোহন আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না, তাহার মন যেন উড়ু উড়ু করিতেছে; প্রাণ যেন বিষম একটা অভাব গ্রস্ত হইয়া আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না। পাড়ার সকলে বুঝাইল—বাবা! পিতামাতা লোকের চিরকাল বাঁচে না —তুমি এত লেখাপড়া শিখিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া কেন শোকে এরূপ অধৈর্য্য হইতেছ? এই বাড়ীঘরগুলি করিয়াছ; গিন্নী বেঁচে থাক্‌তে যেমন ছিলে—তেমনি থাক, টাকার ত অভাব নাই? একটী ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বাপ পিতামহের ভিটেটা বজায় রাখ; তুমি থাক্‌তে গ্রাম থেকে তাঁদের নামটা উঠে যাওয়া কি উচিত? হরিশ মুখুয্যেত এ গ্রামের একটা যে সে লোক ছিলেন না। তাঁদের আশীর্ব্বাদে তুমিও একটা কেউকেটা লোক হও নাই.

বাবা মাথা ঠাণ্ডা করে, বেশ করে বিবেচনা কর; শোকের বশবর্ত্তী হয়ে একেবারে একটা কাণ্ড করে ফেল না।

শ্রাদ্ধের সময় অনাথনাথ আসিয়া কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন—তাহারই কর্ত্তৃত্বগুণে কার্য্যের খুব সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। আর আসিয়াছিলেন—আমাদের জমীদার-পুত্র প্রভাসচন্দ্র;—রমণী কর্ম্মস্থানের দুই পাঁচ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত প্রভাসও. বাদ যায় নাই, কারণ তিনিত বাল্যবন্ধু—যখন সদ্ভাব হইয়াছে, তখন নিমন্ত্রণ বাদ দেওয়া উচিত নয়।

প্রভাস বাবু এ সকল সামাজিকতার বড় একটা ধার ধারেন না; বিশেষতঃ রমণীর প্রতি মনে মনে তাহার জাতক্রোধ থাকিলেও বাহিরে তিনি এমন ভাব দেখান যে তাহার তুল্য প্রিয় সুহৃদ বুঝি রমণীমোহনের আর কেহ নাই। হরিহরপুরের মোকর্দ্দমায় হাকিম রমণীমোহন বন্ধুত্বের খাতির না রাখিয়া সদ্বিচারে ইহাদের সকলের প্রতি দশ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ করিলেও প্রভাস তাহার জন্য বাহিরে কোন প্রকার শত্রুতার ভাব দেখান নাই। ভিতরে যাহাই থাকুক—বাহিরে তিনি সরলতার আধার—এইরূপ ভাব দেখাইয়া বন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধে আসিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে ত্রুটী করিলেন না। এ আমন্ত্রণে আসিবার আর একটী মুখ্য কারণ ছিল—গৌরীর দর্শনলাভ; যে বিষের বাতি তিনি চিরদিন প্রাণে জ্বালিয়া রাখিয়া প্রতিহিংসার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছেন, এ শ্রাদ্ধ কার্য্য কর্ত্তৃত্ব করিতে আসিলে—তাঁহার চির ঈপ্সিত বস্তুকে মনের সাধে ভাল করিয়া দেখা হইবে, তাহাকে তাঁহাদের পরম সুহৃদ বলিয়া জানান হইবে, তাহা হইলে কার্য্যোদ্ধারে আর বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

যখন বুড়ী মারা গিয়াছে, তখন সকল দিক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, রমণী কোন দিক রক্ষা করিবে? এখন স্ঁচ হইয়া ভিতরে প্রবেশ করি, তারপর, জাতি কুল নষ্ট করিয়া ফাল হইয়া বাহির হইব। আমি প্রভাস, এত টাকা আমার; আমাকে বিবাহ করিতে তার প্রবৃত্তি হইল না—এইবার দেখি, সে কেমন করিয়া নিজের জাতিমান সতীত্ব বজায় রাখে?

প্রভাস শ্রাদ্ধের সময় আসিয়া যেরূপ আন্তরিকতা, যেরূপ একপ্রাণতার সহিত বন্ধুত্ব দেখাইয়াছে; একজন ধনী জমিদারের পুত্র হইয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যে নিজের মত যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, তাহাতে রমণী মোহন বাল্য বন্ধুকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এ সময় তিনি যেরূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপর রমণীর কোন প্রকার দ্বিধা ভাব থাকিতেই পারে না। সরল প্রাণা গৌরীও বুঝিয়াছেন—ছেলেবেলায় বাপ মার অতিরিক্ত আদরে প্রভাস খারাপ হইয়া জাহান্নমে গিয়াছিল বটে কিন্তু এখন সে যেরূপ সৎ, যেরূপ পরোপকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার পূর্ব্বের দোষ সমস্ত ঢাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, একটা ভাল বংশের ছেলের মতি গতি ফিরুক, তাহা হইলে জগতের অনেক উপকার হইবে? কিন্তু গৌরী ত জানেন না যে ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরী, বাহ্যিক সৌজন্যের মধ্যে হারামের শোণিত অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রভাস এত নম্রতা স্বীকার করিতেছে?

দেশের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। যাঁহাকে লইয়া রমণীমোহন দেশের মায়ায় এত মুগ্ধ ছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি জন্মভূমির এত শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেন—সেই জননীর পরলোক গমনে দেশের প্রতি তাঁহার

মায়া মমতার হ্রাস হইয়া গিয়াছে। দেশ যে তাঁহার মায়েরই রাজত্ব ছিল, চারিদিকেই যে তাঁহার জননীর সুনিপুণ হস্তের আলেখ্য বর্ত্তমান—যে দিকে চান, সেই দিকেই যে সেই আদর্শ গৃহিণীর হস্ত-কুশলতার মোহন দৃশ্য সকল বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার প্রাণে শোকের জলন্ত স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে, ভুলিবার চেষ্টা করিলেও যে তাহা ভুলা যায় না। অতএব কিছুদিন স্থানান্তরিত না হইলে আর উপায় নাই, নতুবা এ সকল চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে পাগল হইতে হইবে। তাই অনাথনাথ পরামর্শ দিলেন—বাবা! তুমি যেরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছ; তাহাতে কিছুদিন কর্ম্মস্থানে গিয়া থাকাই মঙ্গলজনক, তাহা না হইলে তুমি এ শোকস্মৃতি কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না।

ভাবগতিক দেখিয়া প্রতিবাসী সকলেও সেই উপদেশ দিল। রমণী মোহন ছুটী ফুরাইলে গৌরীকে লইয়া কিছুদিন কর্ম্মস্থানে অবস্থান করুন; বাড়ী ঘর চাবিবন্ধ থাকিয়া পাড়ার লোকের হেপাজাতে থাক, সময়ে সময়ে অনাথনাথ আসিয়া দেখিয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। প্রভাবতী কন্যা জামাতার অকস্মাৎ এ দুর্ঘটনায় বিশেষ অসুখী হইয়াছিলেন কিন্তু দৈবের উপর ত কাহার হাত নাই, মৃত্যুর গতি ত কেহ রোধ করিতে পারিবে না, ।বুঝিয়া তাহাদিগকে অনেক স্তোকবাক্য দিয়াছিলেন, তার পর যখন বুঝিলেন—মা-অন্ত প্রাণ পুত্রের মাতৃ শোকে সান্ত্বনাদান দুই এক দিনের কার্য্য নয়, তখন তিনি রমণীকে সস্ত্রীক কার্য্য স্থানে গমন করিবার আদেশ দিলেন। কর্ম্মস্থানে নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া অন্যমনস্ক হইলে এ শোকের দহন হইতে সহজেই শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আর গৌরী সঙ্গে থাকিলে তাহাতে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। এখন

আর মা নাই যে, দেশে তাঁহার সেবার জন্য পত্নীকে রাখিয়া যাইবেন। বিশেষতঃ যুবতী স্ত্রী, গাভী ও ধান্য কখনও পরের নিকট রাখা উচিত নয়, ইহা চক্ষে চক্ষে রাখাই মহাজন বাক্য! আর গৌরী স্বামীগত প্রাণা, সে স্বামী ছাড়িয়াই বা এ নিবান্ধব পুরীতে একাকিনী থাকিবেন কেন? তখন ছিলেন—শাশুড়ীর সেবার জন্য, তাহার স্বামীর আরাধ্য দেবী কষ্ট পাইলে যে অকল্যাণ হইবে সে অকল্যাণ তিনি সহধর্ম্মিণী হইয়া কেমন করিয়া দেখিবেন? আর শাশুড়ীও যে তাঁহাকে পেটের মেয়ের মত ভাল বাসিতেন—সে ভালবাসার প্রতিদান না দিলে যে ধর্ম্মে পতিত হইবে! এখন তিনি নাই—কেবল বাড়ী ঘর আগ্‌লাইবার জন্য গৌরী দেশে থাকিবেন, আর স্বামী বিদেশে কষ্ট পাইবেন, গৌরী হেন প্রতিপ্রাণা পত্নী কি তাহার অনুমোদন করিতে পারেন? ইহা একান্তই অসহ্য, কাজেই স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থানে যাইতে তিনি নাছোড়বান্দা হইলেন। এত দিন শাশুড়ীর সেবায় রত ছিলেন—এইবার স্বামীর সেবায় তাঁহার অধিকার, সে অধিকারে, তিনি প্রাণপাত করিবেন—স্বামীর সেবাই যে নারী জীবনের সার ব্রত।

যখন সস্ত্রীক যাওয়াই স্থির হইল, তখন ভগীরমার আর যাওয়ার আবশ্যক নাই। সে প্রতিদিন ঘরে ছড়া ঝাঁট, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ প্রদান করিবে—মাসিক যেমন পাইতেছিল, সেইরূপই পাইবে। তাহার জন্য একটা ঘর দেওয়া হইল। অপরাপর ঘরের চাবি পাড়ার একজন মাতব্বরের হাতে রহিল। অনাথনাথ এ চাবি লইতে পারিতেন কিন্তু তিনি থাকেন—কলিকাতায়; রমণী যদি কোন সপ্তাহে বাড়ী আসিতে ইচ্ছা করেন—তাহা হইলে থাকিবার কষ্ট হইবে—এই জন্য চাবি পাড়ার

লোকের হাতে থাকাই ভাল। রমণী ছুটী অন্তে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে সস্ত্রীক বিদেশ গমন করিলেন। পাড়ার লোক অতি কষ্টে তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বাসদানে—"প্রত্যেক ছুটীতে বাড়ী এস, যেন ভুলে থেকোনা বাবা!" বলিয়া বিদায় দিল।

রুদ্রপুরের মুখুর্যে বংশ খুব প্রখ্যাত; এতদিন সিদ্ধেশ্বরী জীবিত থাকিয়া পাড়ার মুখোজ্জল করিয়া ছিলেন। রমণী তাঁহার মানুষ হইয়াছিল, তাই সকলে এইবার আশা করিয়াছিল—আবার এ বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, গ্রামে একটা বড় বংশের নাম বজায় থাকিবে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর স্বর্গগমনে সেই গৃহে চাবি পড়িল দেখিয়া প্রতিবাসী সকলে দুঃখ করিয়া বলিল—কি আর হবে, ভগবান গৌরীর গর্ভে কতকগুলি ছেলে-মেয়ে দিন, তাহারা ঝাড়ে ঝোড়ে বাড়ুক—তাহা হইলে আবার সব দিক বজায় হইবে। বংশবৃদ্ধি না নইলে উপায় নাই।

২৫

সুখ বড় চঞ্চল—কাহার কাছে বেশীদিন থাকে না। মানবজীবনে দুঃখের ভাগই বেশী, বিমল সুখ তার জীবনে ক'দিন? রমণীমোহন আজীবন দুঃখে কষ্টে, পরের দয়ায় মানুষ হইয়া এইবার মনে করিয়াছিলেন—কিছুদিন দুঃখিনী জননীকে সুখে রাখিয়া পুত্র জীবনের বিমল সুখ উপলব্ধি করিব—আহা! মা আমার কত কষ্ট করিয়াছেন—পিতার ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্য না খাইয়া, না পরিয়া, দুঃখকে সুখের

মত বরণ করিয়া আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এত কষ্ট তথাপি কখনও তাঁহার মুখ হাসিশূন্য দেখি নাই; শতগ্রন্থি বস্ত্র পড়িয়াও মা আমার সদাই আনন্দময়ী! একদিনের জন্য আমাকে অভাবের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ব্যতিব্যস্ত করেন নাই, পাছে আমার মন খারাপ হয়, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে।' এমন জননীর প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে পারিলাম না, একটু সুখের মুখ দেখিতে না দেখিতেই তিনি আমাকে ফেলিয়া পালাইলেন। রমণীর প্রাণে সদাই এই তোলাপাড়া, কর্ম্মস্থানে আসিয়াও দিন কতক তিনি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মেলামেশায় এইবার একটু একটু করিয়া প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কিন্তু গৌরীর কষ্টের একশেষ হইয়াছে; তিনি এমন বাসাবাড়ীর মধ্যে এমন বাঁধা ধরায় কখনও থাকেন নাই!

এখানে কোম্পানীর প্রদত্ত বাসায় থাকিতে হয়, পাড়ার লোকজন বড় কেহ নাই, স্ত্রীলোকত মোটেই নয়—এরূপস্থানে পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কাল কাটান বড়ই কষ্টকর! তবে স্বামীর সুখে অরণ্যে বাস করিয়াও হিন্দু স্ত্রী সুখ ভোগ করে—যাহাতে স্বামীর সুখ, তাহাতে গৌরীর অসুখের কারণ কি আছে? দিন দিন স্বামীকে একটু প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া গৌরীর প্রাণে শান্তি স্থাপিত হইতে লাগিল। আর যেখানে কিছুদিন থাকা যায়, সেখানকার দুঃখকষ্ট একপ্রকার সহ্য হইয়া যায়! গৌরীর প্রধান সুখ যখন স্বামীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করা, তিনি যখন ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন, তখন স্বামী-সোহাগিনী গৌরীর প্রাণ আর অসুখী হইবে কেন? তিনি স্বামীর সেবায় প্রাণ মন আহুতি

দিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন! স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার সকল সুখের আকর হইয়া উঠিল।

কোম্পানীর বাসা বাটীতে বেশী খাটা খাটুনী নাই, দাস দাসীতেই সমস্ত করিয়া দেয়—কেবল নিজেদের আহারের জন্য দুই বেলা একটু কষ্ট করিতে হয়। রমণীমোহন হাকিম, তাহার স্ত্রী দুই বেলা হাত পুড়িয়া রাঁধিবে—ইহা ভাল দেখায় না। তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু গৌরী বলিলেন—দেখ তাহা হইলে আমি এখানে থাকিতে পারিব না; চিরদিন উদয় অস্ত পরিশ্রম করা অভ্যাস, আর এখন যদি সমস্ত দিন বসিয়া কাটাইতে হয়, খাওয়াটা পর্য্যন্ত যদি পরের হাতে করিতে হয়, তাহা হইলে গতরে সোঁপোকা ধরিবে—কিছুদিন বাদে আর উঠিতে হইবে না। তুমি আর যা কর, তা কর, ঐ বন্দোবস্তটা করো না। আমি নিকটে থাকিতে তোমাকে পরের হাতে খাইতে দিব না, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে না। ভগীব মার উপর যে ভার ছিল, সে জানাশুনা বামুনের মেয়ে, এখানকার রাঁধুনী বামুনের হাতে তুমি খেতেও পার্ব্বে না, আর খাওয়াও মনের মত হবে না।

স্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া রমণী তাহাই করিলেন, বাস্তবিক একটা অজ্ঞাতকুলশীল মিন্সের হাতে ভাত খাওয়াটা উচিত নয়, আর গৌরীই বা তা খাইবে কেন? সে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, চিরদিন কর্ম্মকুশলা, পরের হাতে খাওয়া কি তাহার শোভা পায়? শারীরিক কিছু পরিশ্রম না করিলেও বাস্তবিক স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। অতএব তিনি আর ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত করিলেন না।

জননী সিদ্ধেশ্বরীর মত স্বামীর রুচি অরুচিকর খাদ্যদ্রব্যের বিষয় গৌরী খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। শাশুড়ী মাথার দিব্য দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—বউমা ! রমণীর খাওয়ার বিষয়ে খুব নজর রেখো, ও এই সকল জিনিষ খায় না, আর এই সকল দ্রব্য খাইতে ভালবাসে !

গৌরী প্রত্যহ বাজারে যাইবার সময় ভৃত্যকে সেইরূপ প্রকার দ্রব্যাদি বাজার হইতে কিনিয়া আনিতে বলিতেন এবং তাহা খুব সন্তর্পণে রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন। আহারাদির উপরেই ত স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তাহা সযত্ন প্রদত্ত ও আন্তরিকতার সহিত প্রস্তুত না হইলে শরীর মন ভাল থাকে না, এই জন্য হিন্দুর আহারে এত বাচ বিচার—এত বাঁধাবাধি, হিন্দুর আহারও শুধু গর্ত্ত বুজান নহে, ইহা প্রাথমিক যোগের অঙ্গবিশেষ, শরীর ধারণে সংযম শিক্ষার প্রথম সোপান !

শোক চিরকাল সমভাবে থাকে না—এইবার স্বামীর চিত্ত বিকার অনেক প্রশমিত হইয়াছে, তিনি এখন পুর্ব্বের মত উদ্যম উৎসাহে কার্য্য করিতেছেন। গৌরী প্রতি সপ্তাহে জননীর নিকট হইতে পত্র পান—তাহাতে অপর কথা বেশী কিছুই থাকে না, কেবল স্বামী সেবার উপদেশে পরিপূর্ণ থাকে। কেমন করিয়া স্বামীসেবা করিলে নারীর নারীত্ব—সেবায় মাতৃত্ব লাভ হয়, প্রভাবতী প্রতি পত্রে কন্যাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কন্যা সে উপদেশ বাল্যকাল হইতে, প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া রাখিলেও কি জানি—ছেলে মানুষ, যদি বাল্য-সুলভ চপলতায় তাহা ভুলিয়া যায়, এইজন্য সতী

প্রভাবতী প্রতি পত্রে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। গৌরী উত্তরে স্বামীর ও নিজের শারীরিক কুশল জানাইয়া, তাঁহাদের পদে প্রণতা হইতেন, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—রমণীমোহন হাকিম হইলেও তাহার দরিদ্রের প্রতি খুব নজর ছিল, কোন অভুক্ত আসিলে তাহার বাটী হইতে ফিরিয়া যাইত না, এখন গৌরীর হাতে গৃহিনীপনার ভার পড়িয়া সে কার্য্য বাড়িয়াছে—ব্যতীত কমে নাই। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খরচ পত্রের বাহুল্য হইয়াই পড়ে; গরীবের ছেলে রমণীর এখন অবস্থা ভাল; তিনি আত্মীয় স্বজনের দুঃখ বুঝেন, তাই এখন নানাস্থান হইতে আত্মীয় স্বজন মামলা-মোকর্দ্দমার সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হয়। বাসায় প্রায়ই দুই চারিজন আগত অভ্যাগত লোক আহার করিত। রমণী গরীবের ছেলে ছিল, ভাতের কষ্ট সে পাইয়াছিল, এ কষ্ট সে ভাল করিয়া অভ্যস্ত বলিয়া, কাহাকেও তাড়াইতে পারিত না? তাহার জন্য একজন পাচক বন্দোবস্ত ছিল। রমণীমোহনের আহারীয় দ্রব্য গৌরীদেবী স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন, কাহারও হাতে এ ভার দিয়া তাঁহার মনপুত হইত না। প্রভাস প্রায়ই এখানে আহার করিত, রমণীর সহিত তাহার খুব মাখামাখি ভাব হইয়া গিয়াছিল।

এ ঘনিষ্টতায় প্রভাসের মাঝে মাঝে গৌরী দর্শণ হইত। হয়ত গৌরী কোন কাজের জন্য গৃহ হইতে গৃহান্তরে অবগুণ্ঠনে চলিয়া যাইতেছেন, প্রভাস অলক্ষ্যে সেই আনন্দময়ী প্রতিমাকে দেখিয়া ফেলিল, নতুবা আজকালকার মত অন্দরের অন্তরতম পত্নীকে রমণী কাহার নিকট বাহির করিতেন না, এখনকার মত সাহেবী সভ্যতা তাঁহার নিকট

ঘৃণাস্পদ ব্যভিচার বলিয়া পরিগণিত হইত। নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী, প্রণয় সরোবরের ফুল্ল সরোজিনী, সহধর্ম্মিণীকে পর পুরুষে কটাক্ষ করিবে—ইহা একান্ত অসহ্য। হিন্দু স্ত্রী যে অসূর্য্যম্পশ্যা, অবস্থা ভাল হইলে সূর্য্যদেবও যে তাঁহার মুখ দেখিতে পান না;—পূর্ব্বে যে এইরূপ আঁটাআটী ভাবই প্রচলিত ছিল!

পুরুষের মত স্ত্রীলোকেরও নাপিতানির আবশ্যক হয়। নাপিতানি গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কাহাকেও আল্‌তা পরায়, কাহারও নখ কাটিয়া দেয়। এখানে মালতী নাম্নী নাপিতানি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া এই কার্য্যে পেটের ভাত করে—সংসারে আর তাহার কেহ নাই। মালতী সবচিন্ লোক, তাহাকে জানেনা চিনেনা, এমন লোক দ্বারকেশ্বর নদীর এপারে ওপারে কেহই নাই। সকল গৃহস্থের বাটীই তাহার যাতায়াত, স্ত্রীলোকদের মধ্যে সকলেই তাহাকে লইয়া রং চং করে,—তাহার দ্বারা ক্ষৌর কর্ম্ম করা, আল্‌তা পরা, নখ কাটা প্রভৃতি কাজ করাইয়া লয়। পূর্ব্বে শিশির গোলা আল্‌তা কিনিয়া স্বহস্তে পরিধান করার নিয়ম ছিল না, যাহার যে কাজ, সে তাহাই করিত, তজ্জন্য গৃহস্থের গৃহে মাসিক কিছু কিছু বন্দোবস্ত থাকিত।

মালতী অল্পবয়সে বিধবা, নানা রসের রসিকা। সে বেশ গান গাহিতে পারিত—ছড়া কাটাইয়া ভৃতীয়ালী করিতে তাহার ক্ষমতা মন্দ ছিল না। এইজন্য পাড়ার রমণী মহলে তাহার আদর যত্ন খুব বেশী ছিল। গৌরী হিন্দু স্ত্রী, নখ কাটা, পায়ে আল্‌তা পড়িবার জন্য সে একদিক আহূত হইয়া গৌরীর সহিত আলাপ করিয়া গেল। এখানে আসিয়া অবধি গৌরী কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন নাই,

কাহাকেও দেখিতে পান নাই। আজ মালতীকে দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল, বিদেশ বিভূমে বহুদিনের পর এমন একটী সঙ্গিনী পাইলে—তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তাই গৌরী দুপুর বেলা যখন কেউ কোথাও থাকিত না—রমণীমোহন আহারাদির পর কাছারী যাইতেন; পাচক ব্রাহ্মণও দাসদাসী বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিত, সে সময় মালতীকে পাইলে গৌরীর আর আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহারা প্রায় সমবয়স্কা—তবে মালতী বৎসর খানেকের বড় হইলেও হইতে পারে। মালতী গৌরীর লক্ষীঠাকুরাণীর মত পাদুখানি হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া যত্নে ধুয়াইয়া দিত, নখ কাটিয়া আলতা পরাইয়া দিত। একেত গৌরী, ঠিক হরঘরণী গৌরীর মত রূপবতী, তাহার উপর আলতা পরিয়া তাহার শোভা যে কিরূপ বাড়িত—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সধবা হিন্দু স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দুর আর পদে আলতা পরিলে যে শোভা হয়, লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ পরিলেও তাহার শতাংশের একাংশও হয় না; তাহার উপর যদি আবার ঈশ্বরদত্ত রূপ থাকে, তাহা হইলেত কথাই নাই। মালতী গৌরীর শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইত!

একদিন গৌরী বলিলেন—ভাই! এখানে এসে অবধি যেন খাঁচায় পোরা পাখীর মত আছি, কাহার সঙ্গে দেখা হয় না, আজ তোমাকে পেয়ে যেন ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না! তোমার নামটী কি ভাই?

নাপিতানী বলিল—আমার নাম মালতী; জেতে আমরা নাপিত—আমার বাপ দাদাও এই কাজ কর্ত্তো; তাহারাই পাড়ার নাপিত ছিল, মাও আমার পাড়ার এই কাজ কর্ত্তো; আমার কপাল পোড়া

তাই এই সোমত্ত বয়সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মর্‌ছি, নতুবা যে স্বামীর স্ত্রী—এই বলিয়া মাল্‌তী চক্ষের জল বাহির না হইলেও কষ্টে দুইএক ফোঁটা বাহির করিয়া তাহা আঁচলে মুছিয়া ফেলিল।

কোমল প্রাণা গৌরী তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ভাই! সবই অদৃষ্ট; তবে জাত্‌ ব্যবসা কর্চ্ছো; ভদ্রলোকের সেবা কর্চ্ছো; এতে তোমার স্বধর্ম্মে থেকে দিন গুজরানও হবে—আর পরকালেও ভাল হবে। কেঁদনা ভাই কেঁদনা!

গৌরী তাহাকে দুই গণ্ডা পয়সা ও চাট্টি চাল দিলেন। আর বলিয়া দিলেন—ভাই! তুমি প্রতি সপ্তাহে এইবারে আমাদের এখানে এসো; সকল স্থানের কাজ সেরে এমনি দুপুর বেলা এস, একলাটী থাকি, তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কহিলেও প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

মালতী গৌরীর রূপ দেখিয়া এবং এত বড় লোকের পরিবারের এমন সরল ও নিরহঙ্কার স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ভাই! যখন আমার এই কাজ, তখন আস্‌বো না কেন? তবে হাকিম হুকুমের বাড়ী এই জন্য ভয় হয়!

গৌরী! কেন মালতী, সে কথা বল্‌ছো; হাকিম বলে কি বাঘ না ভাল্লুক—তাই ভয় হয়, আমার স্বামীকে দেখ্‌লে তোমার ভয় হবে না বরং ভয় পালাবে—তিনি এমনি সরল, এমনি ভাল মানুষ!

মালতী। তা আধখানা দেখে, আধখানার বিষয় সহজেই মালুম হচ্ছে; তিনি যে খুব ভাল মানুষ তা তোমায় দেখেই বুঝতে পার্‌ছি স্বামী ভাল না হলে কি তার স্ত্রী ভাল হয়?

মালতী শুধু নাপিতের মেয়ে নয়, কামানই তার কাজ নয়, সে

ভদ্রসমাজের মত কথা কহিতে জানে দেখিয়া গৌরী বড় আপ্যায়িত হইলেন, মনের মত একজন সঙ্গিনী পাইলেন দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। মালতীকেও দেখ্‌তে মন্দ নয়। তার উপর তার এই ভরা যৌবন—রূপের জলুসও আছে ; তবে ভদ্র গৃহের বউয়ের মত সেত আর ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকিতে পার না—দুঃখের জালায় এপাড়া সেপাড়া ঘোড়াঘুরি করিয়া তার রূপ যেন এক রকম এলোমেলো হয়ে পড়েছে—পাঁশ ঢাকা আগুনের মত ফুটিতে পায় না। দুঃখ-রাহুর গ্রাসে পড়িলে মানুষের এইরূপ সবই নষ্ট হয় !

অনেকক্ষণ আসিয়াছে, আরও পাঁচবাড়ী যাইতে হইবে—মালতী আর বসিল না ; উঠিয়া বলিল—দিদিমণি ! আমি আর সপ্তাহে ঠিক এমনি সময়েই আস্‌বো ; এখন তবে আসি, বলিয়া মালতী বাটীর বাহির হইয়া গেল। গৌরীও—"ভাই তবে এসো, মনে যেন থাকে," বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া দরজায় খিল দিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

দুই আনার পয়সা ও এত গুলি চাল পাইয়া মালতী মনে করিল—এমন খদ্দের জন কতক থাক্‌লে আর ভাবনা কি ? তা নয় সমস্ত দিন খেটে কোথাও কেবল আশীর্ব্বাদ, কোথাও দুটো আলু-বেগুন, না হয় দুমুটো চাল—আল্লাদীরে পয়সা ত বার কর্ত্তেই চায় না। কেবল আল্‌তা পরাও, নোক কাট ; তারপর গান কর, ছড়া কাটাও—ফরমাস্‌ কত ! এমন না হলে খদ্দের ?

মালতীর অর্থের উপর নজর খুব বেশী—তার তিনকুলে কেউ না থাক্‌লেও সে খুব সৌখিন ; কাজেই হা পয়সা হা পয়সা করেই মরে ; তবে পয়সার জন্ম যে সে জাতি নষ্ট করেছে বলে শুনা যায়

নাই। ইহার জন্য সে অন্যের জাতি নষ্ট কত্তে পারে, তথাপি নিজের উপর কেহ কটাক্ষ করিলে, তাহার চৌদ্দ পুরুষের নাম শুনাইয়া দেয়, নাপিতানী এমনি ধড়িবাজ!

"আহা মেয়েটীত নয় যেন প্রতিমে; আর না হবেই বা কেন? জাহানাবাদের বড় হাকিমের পরিবার—একটা কি যে সে মানুষ; দিতে থুতেও বেশ জানে, পায়ে আল্‌তা পোরে কে কোথায় দুই আনা দেয়, যাই হউক—এমন খদ্দেরটা এখন থাক্‌লে হয়।" গৌরীর এইরূপ খোস্ নাম করিতে করিতে মালতী বাড়ীমুখে রওনা হইল। তার বাড়ী নদীর পরপারে কালীপুরে; প্রত্যহ সে এইরূপে এপার ওপার করিয়া দিন দুপুরে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিত।

২৬

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যুবক মহলে একটা বনভোজনের আমোদ প্রচলিত ছিল। সমবয়স্ক যুবকগণ একত্র মিলিত হইয়া গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করতঃ নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর আহারাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিত ও বিশুদ্ধ আমোদে কিছু সময় অতিবাহিত করিত।

এখন ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে গার্ডেন পার্টি নামক একটী আমোদ-প্রমোদের প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ধনী পদস্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাই ইহার অনুষ্ঠান করিয়া প্রায়ই সান্ধ্য ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কোথাও কোথাও মধ্যাহ্ন

ভোজনও হইয়া থাকে; তবে ইহাতে যে তাদৃশ বিশুদ্ধতা রক্ষা হয়—বলিয়া মনে হয় না।

জাহানাবাদের হরিহরপুরে প্রভাস বাবু যখন জমীদারীতে অবস্থান করিতেন, তখন প্রায়ই এইরূপ গার্ডেন পার্টি অর্থাৎ সান্ধ্য ভোজের ব্যবস্থা হইত। তথাকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রভাসচন্দ্র ভোজন করাইতেন। সুরাদেবীর অর্চ্চনা; বারবিলাসিনীর বন্দনা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে হইত। মহকুমার অনেক হাকিম, উকীল, মোক্তার ইহাতে যোগদান করিতেন।।

জাহানাবাদ মহকুমায় সুরার প্রচলন খুব বেশী, কিন্তু কলিকাতার মত মনোমত বেশ্যারই অপ্রাপ্তি। কুসুমপুরের অভিনয় শেষ করিয়া প্রভাস যখন এখানে আসিয়া আড্ডা গাড়িল—তখন তাহার অভিনয়ের প্রধান অভিনেত্রী হইয়াছিল—মালতী নাপিতানী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—মালতী বালবিধবা, তখন তাহার রূপ-যৌবন দুই বর্ত্তমান ছিল—ক্ষৌর কর্ম্ম অছিলা করিয়া সে অনেক বাড়ী ঘুরিত, অনেকের হাঁড়ির খবর রাখিত। সে নাচিতে গাহিতে জানিত—তাহার কোকিল কণ্ঠের স্বরলহরীতে প্রভাস বাবু যারপর নাই মুগ্ধ হইয়া বাগানের এই আমোদ-প্রমোদের প্রধান অভিনেত্রী করিয়াছিলেন!

মালতী নাপিতানী খুব ধূর্ত্ত, প্রভাস বাবু তাহাকে এত করিয়াও বশীভূত করিতে পারে নাই। সে কোন প্রকারেই তাহার ফাঁদে পা দেয় নাই। তবে কার্য্যের সময় আসিয়া নাচ গান করিত, মদ খাওয়াইয়া সকলকে মাতাল করিয়া শেষে পয়সা কড়ি কিছু বক্‌সিস লইয়া বাড়ী চলিয়া যাইত;

হিংস্রুকের হিংসাবৃত্তি যতদিন চরিতার্থ না হয়, ততদিন সে হিংসা করিতে ছাড়ে না। গৌরীর প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে; তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রভাস চিরদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিন্তু এতাবৎকাল সে তাহার তিলপরিমাণ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। কত কাছে কাছে ঘুরিয়াছে, তাহার স্বামী রমণী-মোহনের সহিত কত ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়াছে, তাহাদের দুঃখে কত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—তথাপি তাহার অদৃষ্টে গৌরীর পা ভিন্ন মুখ দেখিবার সুযোগ কখন হয় নাই, গৌরী এমন লজ্জাশীলা, বিলাস-বিহীনা সতী!

সে এইবার তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়া গার্ডেন পার্টির ভাণ করিয়াছে—তাহাতে রমণীমোহনকে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে। প্রত্যেক কর্ম্মক্লান্ত মানবীই অবসর সময়ে একটু আধটু আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতে ইচ্ছা করে, ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে! আদালতের অনেক উকীল মোক্তার যখন এখানে আসেন, তখন তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে রমণীমোহন ইহাতে যোগদান করিতে লাগিলেন।

গৌরী কিছু জানিল না শুনিল না, রমণীমোহন প্রতি শনিবার গৃহে আহারাদি করেন না। রাত্রি বারটা একটার সময় গৃহে আসেন, গৌরী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—ভাল ভাল লোক খাতির যত্ন করিয়া লইয়া যায়, না যাইয়া কি করি বল? লোকে পাছে পদমর্য্যাদার অহঙ্কারী মনে করে—এই ভয়ে যাইতে হয়। গৌরী বলিলেন—তা যাও কিন্তু সাবধান, এ বিদেশ বিভূমে একটু দেখিয়া শুনিয়া লোকের সহিত মেলামেশা

করিও, যার তার সহিত মিশিয়া পদের গৌরব নষ্ট করিও না; আর অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেও দিও না।

একঘেয়ে কর্ম্মক্লান্ত জীবন বহন করা দায়, যদি কোন প্রকার আমোদ আহ্লাদের আদান প্রদান করিয়া তাহার ভার লাঘব করা না যায়, তাহা হইলে মানুষ শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, জীবনভার দুঃসহ হইয়া উঠে। এই জন্য কঠোর পরিশ্রমের পর বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন!

রমণীমোহন তাই আদালতের উকীল মোক্তার ও বন্ধু প্রভাসচন্দ্রের অনুরোধে সন্ধ্যার সময় তাহার সম্মিলনীতে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌরীর নিষেধে প্রথম প্রথম তিনি তথায় জলগ্রহণ করিতেন না; দেখিয়া শুনিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া বাড়ী ফিরিলে পর তাহাদের বীভৎসকাণ্ড আরম্ভ হইত। মহকুমার বড় হাকিমের নিকট ত আর বেলেল্লাগিরী চলে না?

প্রভাসের এ সম্মিলনের আয়োজন করিবার উদেশ্য রমণীমোহনকে বশীভূত করা, তাহা হইলে গৌরী দর্শন তাহার পক্ষে সুলভ হইবে। আরও তাহার মনে কি দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা ভগবানই জানেন; এই জন্য প্রতিদিন রমণীকে খাওয়াইবার জন্য সে বিশেষ অনুরোধ করিত।

রমণীমোহন আদর্শ চরিত্র এবং মহকুমার প্রধান হাকিম—সকলেই তাঁহাকে সম্মান সম্ভ্রম করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় পরোপকারী, দরিদ্র-বন্ধু, ন্যায়পরায়ণ হাকিম এ জেলায় কেহ আসে নাই বলিয়া তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন।

পত্নীর মুখ চাহিয়া, তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য

করিবার জন্য তিনি বহুদিন ইহাদের অনুরোধ এড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু আজ দারুণ গ্রীষ্মে প্রাণ আইঢাই করিতেছে—পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। রমণীমোহন প্রভাসের সুরম্য বাগান বাড়ীতে ইতস্ততঃ পদচারনা করিয়া পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন—অজস্র ঘাম ঝরিতে লাগিল, দেখিয়া প্রভাস বলিল—ভাই! কিছু না খাও, এ দারুণ গ্রীষ্মে এক গেলাস সরবৎ ও একবাটী দুগ্ধ খাইতে দোষ কি? তুমি খুব নিষ্ঠাবান তা জানিকিন্তু ইহাত আর অখাদ্য নয়?

পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সেদিন আর তিনি বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। রমণীমোহন পিপাসা নিবৃত্তির জন্য একটু সরবৎ পান করিলেন। উপস্থিত সেই সুস্বাদু সৌগন্ধ বিশিষ্ট পানীয় পানে পিপাসার তৃপ্তি হইল বটে কিন্তু তাহার গা কেমন কেমন করিতে লাগিল। বমি হইবার উপক্রম হইল, গা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল; অতিরিক্ত গরমে একবারে দেহ শীতল হইয়াছে, সর্দ্দিগরমি হইবার ভয়ে তিনি পাল্কী করিয়া বাড়ী আসিতে বাধ্য হইলেন।

যে রমণীমোহন সঙ্গীতের এত প্রিয়, নাচগানে যিনি মুগ্ধ হইয়া অভিনেতাকে কত বকসিস্ প্রদান করেন, আজ কয়েক জন সুবিখ্যাত গাহকের নাচ গান প্রত্যাখান করিতে বাধ্য হইলেন, শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন বাড়ী চলিয়া আসিতে আর বিলম্ব করিলেন না। সরকারী হাঁপাতালের বড় ডাক্তারও সেই ভোজে উপস্থিত ছিলেন—তিনি ভিতরের সংবাদ কিছুই জানেন না, তবে হঠাৎ রমণীমোহনের এরূপ হওয়ায় তিনি সর্দ্দিগরমিই অনুমান করিলেন, তাই আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

রমণীমোহন বাড়ী চলিয়া আসিয়া কিছু আহারাদি করিলেন না— শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন দেখিয়া, গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন— সমস্ত দিনের পর কাছারী হইতে আসিয়া সেই দুধটুকু আর একটু মোহোনভোগ খাইয়াই সমস্ত রাতটে কাটিয়ে দেবে? যা পার দুই একখানা লুচীও খাওনা, নতুবা শরীর যে বড় কাহিল হইবে. কাল কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট হইবে?

রমণীমোহন বলিলেন—না গৌরি! আজ অতিরিক্ত গরমে বাগানে বেড়াইতে গিয়া পিপাসার দরুণ প্রভাসের অনুরোধে এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা সরবং খাইয়া যেন সর্দ্দিগরিমী হইবার উপক্রম হইয়াছিল, গা গুলাইয়া বমির উপক্রম হইয়াছিল। তাহাই ডাক্তার মহাশয় দেখিয়া বলিলেন—খুবেবেশী গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া এমন হইয়াছে. আপনি বাড়ী গিয়া বিশ্রাম করুন, সুনিদ্রা হইলেই সমস্ত সারিয়া যাইবে। এই জন্য আসিয়া শুইয়া পড়িলাম, একটু ঘুম হইলেই সমস্ত ভাল হইয়া যাইবে, তুমি কিছু ভেবো না, বলিয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিলেন। পতিগতপ্রাণা গৌরী স্বামীর পদপ্রান্তে সেবায় রত হইলেন।

২৭

সমস্ত রজনী বেশ সুনিদ্রা হইয়া প্রাতঃকালে রমণীমোহন সুস্থ দেহে গাত্রোত্থান করতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন! গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন শরীরটা কেমন, কোন গ্লানি বোধ হইতেছে কি?

রমণীমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি একটুতে বড়ই অধৈর্য্য হয়ে পড়ো; মানুষের শরীরে কি একটুও অসুখ হইবে না? তুমি যে আশ্চর্য্য করলে দেখছি, যাহা হউক, আর কোন গ্লানি নাই, আমি বেশ সুস্থ আছি, বলিয়া রমণীমোহন প্রাতভ্র্মণে বাহির হইলেন।

গৌরী স্নান করিয়া প্রতিদিনের মত আজও স্বামীর মঙ্গলার্থে মঙ্গলময়ের যথাবিধি পূজা করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিলেন। রমণীমোহন ঠিক সময়ে আসিয়া আহারাদি করতঃ কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। পূর্ব্বের মত প্রত্যহই কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন, দেখিয়া গৌরীর প্রাণের আশঙ্কা দূর হইল।

আজ কিছুদিন হইল রমণীমোহনের আহারাদির বড় কষ্ট হইতেছে। তিনি মাছ মাংস খান্ না; দুগ্ধ যাহা বরাদ্দ ছিল, গোয়ালা তাহাও আর সরবরাহ করিতে পারে না, উমেশ পাড়ায় অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু খাঁটী দুগ্ধ মেলা ভার, গৌরী বিষম ভাবনায় পড়িলেন। ভগীর মা থাকিলে চেষ্টা করিয়া আনিতে পারিত, কারণ সে এখানে বহুদিন থাকিয়া অনেকের সহিত অলাপ করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু গৌরী কুলবধূ, তায় পদস্থ ব্যক্তির পত্নী, এ অপরিচিত স্থানে কেমন করিয়া দুধের সন্ধান করিবেন? ভৃত্যটীকে ও ঠাকুরকে ইহার জন্য অনেক বলিয়াছেন, তাহারা দুই একবার চেষ্টাও করিয়াছে কিন্তু পায় নাই—আর দূরস্থ লোক দুধ বিক্রয়ের জন্য এতদূর আসিতে চায় না, সম্ভ্রান্ত গৃহে তখন দুগ্ধ বিক্রয় মহাপাপ বলিয়া কেহ রাজী হইত না।

আজ রমণীমোহন আহারাদি করিয়া কষ্টে আদালতে গিয়াছেন, তাহার মস্তিষ্ক বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। গৌরীদেবী স্বামীর

অসুস্থতা হেতু অনিচ্ছা সত্বেও কিছু আহার করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতেছেন—কি উপায় করি, পিতামাতাকে সংবাদ দিব না কি? এমন সময় মালতী নাপিতানী আসিয়া ডাকিল, গৌরীদিদি! আজ—আল্‌তা পরিবে, কামাইবে কি? সধবা স্ত্রীর আল্‌তা পরা; সীমন্তে সিন্দুর ধারণ স্বামীর কল্যাণার্থে. নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি যত হউক আর না হউক, হিন্দু স্ত্রী স্বামীর মঙ্গলের জন্য ইহা ধারণের একান্ত পক্ষপাতী; তাই মালতীর আহ্বান শুনিয়া গৌরীদেবী ডাকিয়া বলিলেন—আল্‌তা পরি আর না পরি তুই একবার আয় না—অনেক কথা আছে;।

মালতী গৌরীর প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিল—তিনি মেজের উপর আলু থালু ভাবে বসিয়া আছেন; যেন কতই বিষন্ন—একটা চিন্তার ভাব তাঁহার বদনে নয়নে যেন মাখিয়া রহিয়াছে। মালতী দেখিয়া বলিল—কেন দিদিমণি! আজ এমন ভাব, কোন অসুক বিসুক করে নাই ত?

গৌরী।—ভাই! আমার অসুক করলে ত ভগবানের সোজা বিচার হতো, যার অসুক করলে আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আজ কয় দিন তাঁর শরীর বড় খারাপ হয়েছে; তিনি কিছু প্রকাশ করেন না কিন্তু আমিত বুঝতে পারছি।

মালতী।—যাঁর অসুক তিনি কিছু জানেন না—বলেন না, আর তুমি কেমন করে জান্‌লে-বুঝলে ভাই?

গৌরী।—মালতী, ঐ টুকুইত স্ত্রীত্ব; স্বামীর শরীর ভাল কি মন্দ,কোন গ্লানি আছে কি না আছে, তিনি বল্লে তবে জানিতে পারবো, নইলে নয়? তাই যদি হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর একত্ব কোথায়? অর্দ্ধাঙ্গিণী ভাব রইলো

কেমন করে! শরীরের এক অঙ্গে বেদনা হলে—আর এক অঙ্গ কি জানিতে পারে না?

মালতী।—দেখ দিদিমণি! তোমরা একেবারে স্বামী স্বামী করে যেন পাগল হও; দুই একদিন ভাল করে কথা না কইলে—মনে করো যেন কত অসুক হয়েছে, এসকল ভাব কিন্তু ভাই তোমার কাছেই শুনি, কই অপরেও ত স্বামী নিয়ে ঘর করে, তারা ত কই স্বামীর জন্য এত উতলা হয় না? কোথায় কি এক আধ দিন একটু কাজের ভিড়ে তেমন বেশী কথা বার্ত্তা কন নাই, তুমি অমনি ধরে বসেছ—তার শরীর খারাপ হয়েছে। শরীর খারাপ হইলে কি তিনি তোমাকে কিছু বল্‌তেন না?

গৌরী।—তিনি বল্লে ত সকলেই জান্‌তে পারবে, তার প্রতিকার কর্ব্বে কিন্তু তিনি না বল্লেও তার মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট আমি যদি না জান্‌তে পারি, তা হলে অপরে আর আমাতে তফাৎ কি?

মালতী।—তোমার এক সৃষ্টি ছাড়া কথা ভাই, আর যেন কেউ স্বামী নিয়ে ঘর করে না?

গৌরী।—তুই যতই বল মালতী; আমার কিন্তু বড় ভাবনা হয়েছে, এই বিদেশ বিভূমে কাছে নিজের লোক কেউ নাই, কি করি তাই ভাবছি, মা বাবাকে খপর দিব বলে ইচ্ছে করছি!

মালতী।—বিদেশে বেশী ঝঞ্ঝাট বাড়ালে ত আরও বেশী কষ্ট হবে, এমন অসুক কিছু করেনি ত যে লোকের দরকার, আর দরকার হলে তাঁর আবার লোকের ভাবনা কি, একবার হুকুম কল্লে গাঁ শুদ্ধ লোক এসে পড়বে! তিনি এখনও ঠিক কাছারী যাচ্ছেন ত?

গৌরী।—কাছারী যাবেন না কেন; তবে যে ভাবে যান—যেন ইচ্ছা

নাই ; কাছারী থেকে এসেই না খাওয়া না জিরোনো আবার কোথা এক সন্ন্যাসী সাধু বাবা এসেছেন, তার কাছে চলে যান, কত রাত্রে এসে তার ধর্ম্মব্যাখার কথা কইতে কইতেই চক্ষের জলে বুক ভেসে যায়, তার পর এপাশ ওপাশ কর্ত্তে কর্ত্তে রাত কেটে যায়, এই জন্য কি শরীর খারাপ হচ্ছে মালতী ?

মালতী।—সেই কথা নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করেন—মগ্ন হয়ে যানত ?

গৌরী।—হাঁ মালতী, একেবারে তন্ময়, বাহ্যজ্ঞান থাকে না, এই জন্য বলছি,—কত লোক্ ত শুনতে যায়, তবে ওঁর কেন অমন হয় ?

মালতী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, বলিল—গার্ডেন পাটিতে কয়েক দিন গেছলেন, আর যান কি ?

গৌরী।—সেই হতেই ত এই ভাবের সুরু হয়েছে, যেন পাগলের ভাব, কে যে কি করলে তাত বল্‌তে পারি নি ?

মালতী।—তোমার এক কথা, অত বড় একটা দিগ্‌গজ হাকিমকে কে আবার কি কর্ব্বে ; ধর্ম্মকর্ম্মে মেতে ঐ রকম হচ্ছে, সাধু সন্ন্যাসীরা পয়সা পাবার জন্য মানুষকে কেমন গুণ করে ফেলে, তুমি তাঁকে সে খানে যেতে বারণ করো না কেন ?

গৌরী।—ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ত্তে কি আর স্ত্রী স্বামীকে বারণ করে, তিনি ত আর বদ্‌খেয়ালী করে কোথাও রাত কাটাতে যাচ্ছেন না ; আর তাঁকে বারণ করবার আমার ক্ষমতা কি ? তিনি কি অবুঝ, আমার মত বুদ্ধিহীনা মেয়ে মানুষ যে বারণ কর্ব্বো, তাঁর বারণ বরং আমি শুনবো, কি কর্ত্তে আছে না আছে তিনিই আমাকে শিক্ষা দিবেন, আমি তা কায়মনে পালন কর্ব্বো।

মালতী।—তিনি যদি কোন খারাপ কাজ করেন, তা হলে তুমি বারণ কর্ব্বে না ?

গৌরী।—মালতী, আমি সে বিষয় খুব জানি, তাঁর দেবতুল্য চরিত্রে কোন মন্দ আচরণ আস্‌তে পারে না ?

মালতী।—যদি আসে এবং ধর্ম্মের ভাণে অধর্ম্মে মজিয়া কোন কুসংসর্গে জড়িয়ে পড়ে যদি তোমাকে ভুলে যান ?

গৌরী।—মালতী তা হতে পারে না—তিনি আমাকে ভুল্‌তে পারেন না।

মালতী।—কি করে তুমি জান্‌লে—পুরুষের প্রাণে কত প্রকার ভাব তোলা পাড়া করে, বিশেষতঃ পয়সাওয়ালা পুরুষের প্রাণ তুমি কেমন করে বুঝবে ?

গৌরী।—আমার নিজের প্রাণের মত তাঁর প্রাণও আমি খুব বুঝি ? স্বামী স্ত্রী যে একপ্রাণ এক অাত্মা ; তিনি আমার অজানিত কোন কাজ কর্ত্তে পারেন না, কর্ত্তে গেলেই আমার প্রাণের সূতায় টান পড়বে, আমি জান্‌তে পারবো ?

মালতী।—তবে কেন উতলা হচ্ছো, অসুক করেছে বলে ভেবে মরছো ?

গৌরী।—মালতী, তুই যা বল্‌ছিস—এ তা নয়, অকলঙ্ক চন্দ্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই—তবে শরীরে যে একটা কিছু ব্যাধি প্রবেশ করেছে—তা জান্‌তে পেরেই ত ভাবছি—আর সে ভাবনার প্রতিকার কি করা যায়, তাই তোকে জিজ্ঞাসা করছি ?

মালতী।—গৌরীদিদি ; তুমি জামাই বাবুকে অত গঙ্গার জল বলে

মনে করো না, পুরুষ মানুষকে তুমি বুঝো না ; তাই অত বিশ্বাস কর ?

গৌরী।—না লো না, তোর এ সকল বুঝবার ক্ষমতা নেই, প্রাণে প্রাণে এক হয়ে গেলে—মনের ভাব কাহার অজানা থাকে না, দর্পণের সন্মুখে দাঁড়ালে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, আত্মায় আত্মায় এক হয়ে গেলে—সেইরূপ একজনের হৃদয়-ভাব আর একজনে জান্‌তে পারে, তুই ত কখন কাকেও একেবারে আত্ম সমর্পণ করেসনি, তা বুঝ'ব কেমন করে ? আর আমিই বা তোকে বুঝাব কেমন করে ? এতো বুঝাবার নয়, এ যে অনুভবের বস্তু, কথায় বলে কি বুঝান যায় ?

মালতী।—আর বুঝাইবার দরকার নেই ভাই ; তোমাদের ভাব তোমাদেরই থাক্ ; তোমাদের মত ভাতার পাগ্‌লা ছুড়ী গুলাই ত পুরুষের মান অত বাড়িয়ে ফেলেছে, তাই পুরুষ গুলো মাগীদের আর তত কেয়ার করে না, ঠিক দাসীর মত করে রেখেছে—এ সকল ধরণ আগেকার, এখনকার নয়।

গৌরী।—আগেকার আর এখনকার কি, নারীজাতি সেবা কার্য্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, জগতে সেবা করাই তার কাজ, তাই সে চিরদিন সেবিকা বা দাসীরূপে হয়—পিতামাতা, না হয় শ্বশুর শাশুরী, অথবা স্বামী পুত্রের, এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করেই জন্ম সার্থক কর্ব্বে, ভগবানের আদেশে এ ব্রত তাদের পালন কর্ত্তেই হবে, নতুবা সেবাধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর বার হলেই কি জীবন সার্থক হবে ?

মালতী।—তবে অতটা পরাধীনতা, অতটা দাসীপনা ভাল নয় !

গৌরী।—পরাধীনতা কি, তুই কি মনে করিস্—স্বামীকে অবহেলা

করে, গুরুজনকে অভক্তি করে, বাইরে বাইরে ঘুরলেই নারীর মান বৃদ্ধি হবে ? তা হয় না, যার যা ধর্ম্ম, তা তাকে মেনে চললেই অতুল সুখ। পুরুষের প্রকৃতি আর নারীর প্রকৃতি ঠিক এক হতে পারে না—এক করে চলতে গেলেই বিভ্রাট হবে। পুরুষের মেয়েমানসী ভাব যেমন দোষের আকর, স্ত্রীলোকের পুরুষ-ভাবও তেমনি অতীব নিন্দনীয়! সন্তান প্রতিপালন, রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি যেমন পুরুষের কাজ নয়, মেয়েদেরও তেমনি অফিস আদালতে যাওয়া নিতান্ত বিসদৃশ—ধর্ম্ম সঙ্গত নয়। ঘরের মধ্যে থেকে স্বামী-পুত্রের সেবা করে, আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালন করে মহত্ব দেখানই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহাই বিধাতার বিধান, ইহাতেই তাহাদের মাতৃত্ব সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠে, বিশ্বে দয়ার রাজত্ব বিস্তার করিয়া দেয়, মরুময় পৃথিবীকে অমৃতের সর স নন্দনে পরিণত করে।

মালতী।—তবে কি তুমি নারীকে কেবল সেবাদাসীরূপে অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকতে বল!

গৌরী।—আমি কেন বলবো লো! তার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্মই যে এই, এইজন্যই যে তার জন্ম। স্নেহ-প্রেম, ভালবাসা যে তার স্বভাবের সহিত জড়িত, যাহার তাহা নাই, সে নারী নারীনামের অযোগ্য। প্রেম, ভক্তি ভালবাসা, মায়া মমতাই হচ্ছে নারীর নারীত্ব, ইহাই তাহার বিশেষত্ব—এই সেবা ধর্ম্মের মধ্যে দিয়ে তাহাকে কোমলতার আধার করে বলেই নারীর স্বভাব এত কোমল, তবে দুর্ব্বল বলে মনে করিসনে, প্রেম-ভালবাসায়, স্নেহমমতায় দৌর্ব্বল্য আসতে পারে না ইহাতে দুর্ব্বলতা নাই বলিয়াই তাহার শক্তি অনন্ত অসীম, দুরন্ত অসুর দলনে তাই ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিতে তাহারা সমর্থ, তুই অন্তঃপুরাবদ্ধা হিন্দু নারীকে কি এতই

অপদার্থ বিবেচনা করিস্! বলিতে বলিতে গৌরীর দেহে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। মালতী ভয়ে বিস্ময়ে আকুল হইয়া থতমত খাইয়া বলিল—না-না তা বল্‌ছি না; তবে এতটা স্বামীভক্তি আর কাহার দেখি নাই।

গৌরী।—যাহার নাই সে নারী, নয় হেলায় বিধাতৃ বিধান অবহেলা করতঃ একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া অকুলে পড়িয়াছে, মাতৃত্বের, মহিমা নষ্ট করিয়াছে। যে নারী স্বামীকে বুঝে না মানে না, ভক্তি করে না—তাহার মুখে আগুন!

মালতী ভয়ে ভয়ে আর কোন কথা তুলিল না বলিল, বেলা পড়ে আস্‌ছে; এসো তোমাকে আল্‌তা পরিয়ে দিয়ে অন্যত্র যাই! এই বলিয়া সে গৌরীর পা দুখানি আল্‌তার রঙ্গে রঙ্গাইয়া দিল।

গৌরী তাঁহাকে সে দিন চারি আনার পয়সা দিয়া বলিলেন—ভাই! তোর একদিনকার পয়সা বাকী ছিল, আজ নে; তার পর বলিলেন—হ্যাঁ ভাই মালতী! দুধের ত বড় অভাব; ওঁর মাছ খাওয়া নাই, দুধ ঘি একটু না হইলে শরীর থাকে৷কি করে? তুই ভাই আমার বিদেশের একমাত্র বন্ধু; খাঁটি দুধ ঘিয়ের একটু জোগাড় করে দিয়ে তোর জামাই বাবুর স্বাস্থ্যটা একটু ভাল করে দে না! এই বলিয়া গৌরী উত্তেজিত স্বর নামাইয়া যারপর নাই মলায়েম ভাবে মালতীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। গৌরীর মত স্বামী অনুরাগ সে আর কোন মেয়ে মানুষে দেখে নাই, তাই সে এদিকে আসিলেই একবার গৌরীর সহিত দেখা করিত—তাহার অতুলনীয় স্বামী ভক্তির কথা শুনিয়া চির অতৃপ্ত প্রাণে তৃপ্তিলাভ করিত। আজ গৌরীর অনুরোধ সে এড়াইতে না পারিয়া বলিল—আচ্ছা দিদি,

আমি সংগ্রহ করিয়া দিব—এখন আসি, বলিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল।

২৮

দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে, আকাশে মেঘের নাম মাত্র নাই, চারিদিক তাম্রবর্ণ; গরম বাতাস আগুনের হল্কা লইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া জীব জীবনে দারুণ অশান্তি প্রদান করিতেছে। রমণীমোহন আজ আদালতে যাইয়া একটী সঙ্গীন মোকর্দ্দমার বিচার করিতে করিতে বৈকালে হঠাৎ আসন হইতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তারপর পাগলের মত কত কি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

আরদালী ছুটীয়া আসিয়া তাঁহাকে খাস্ কমরায় লইয়া গেল এবং হাঁসপাতালের বড় ডাক্তারকে সংবাদ দিল। ডাক্তার রমণীমোহনের বন্ধু, সংবাদ পাইবা মাত্র দৌড়িয়া আসিলেন এবং অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—দারুণ গ্রীষ্মে অতিরিক্ত মানসিক চিন্তায়, মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে, যেরূপ ভাব তাহাতে পাগল হইবার সম্ভাবনা; তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্কী করিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামীকে তদবস্থায় বাড়ী আসিতে দেখিয়া গৌরীর প্রাণ উড়িয়া গেল, হায় কি হল বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে বলিল—মা বড় ডাক্তার বলিয়াছেন, কোন ভয় নাই: দারুণ গ্রীষ্মে অতিরিক্ত মানসিক চিন্তায় এমন হইয়াছে, শীঘ্র আরাম হইবেন। গৌরী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন, আহার নিদ্রা তাঁহার ত্যাগ

হইল। প্রভুভক্ত উমেশ অনবরত ডাক্তারখানা যাতায়াত করিতেছে;— ডাক্তার বাবু বন্ধুর পীড়ায় প্রাণান্ত করিতেছেন। এত বড় একজন হাকিমকে সত্বর আরোগ্য করিতে হইবে—সরকারী হুকুম কিন্তু বিধাতা নারাজ হইলে ডাক্তারের চেষ্টায় কি হইবে? রোগ ক্রমশ: বাড়িয়া যাইতে লাগিল। রমণীমোহন মস্তিষ্ক বিকারে ভুগিয়া পাগল হইয়া গেলেন, নানা প্রকার অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

মালতী প্রতিদিন আসিয়া দুগ্ধ প্রদান করে কিন্তু খাইবে কে? রমণীমোহন পাগল হইয়াছেন, আহারে রুচি নাই খাদ্যাদি সমস্ত ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করেন দন্ত কড়মড় করিয়া একে তাকে মারিতে যান উমেশ ভাড়াবী বহুকষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। নিরীহ নিষ্কলঙ্ক বিদ্যামোদী স্বামীর এ ভাব দেখিয়া পতিপ্রাণা গৌরীর প্রাণ কিরূপ হইয়াছে, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই—তিনি অহোরাত্র কেবল কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন আর দেবতার কাছে বলিতেছেন— ঠাকুর! একি করিলে, ক্ষণিক সুখের পর অমাবস্যার এ দারুণ অন্ধকার কেন আনিলে প্রভু! যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে শাস্তি দাও, আমার হৃদয় দেবতাকে এ বিষম ব্যাধি হইতে মুক্ত কর!

মালতী হাজার হউক স্ত্রীলোক, সে গৌরীর দুর্ভাগ্য দেখিয়া বিচলিত হইল। তাহ সে পীড়া আরোগ্যের ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ডাক্তারে —ইহার কিছু করিতে পারিবে না। মালতী চিরোলময়ীর শরণাপন্ন হইতে গৌরীকে অনুরোধ করিবে বলিয়া আজ প্রাতঃকালেই আসিয়াছে।

গৌরীদেবী পূজাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবা মাত্র, সে বলিল— দিদি মণি! বাবু যে পীড়ায় ভুগিতেছেন, ইহা চিকিৎসায় শীঘ্র আরাম হইবে

না, মা তিরোলময়ীর শরণাপন্ন হইয়া বালা ধারণ করিলে শীঘ্র আরাম হইতে পারে, এ সকল রোগে দৈবই প্রধান সহায়! উমেশ ভাড়ারীও সেই কথায় সায় দিল।

"নচদৈবাৎ পরম বলং" স্বাধ্বী গৌরীদেবীও তাহা খুব বিশ্বাস করেন, তিনি বলিলেন—কোথায় সে দেবীর মন্দির। মালতী বলিল—এখান হইতে বেশী দূর নহে, খুব কাছে। গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে উমেশকে বলিলেন—আচ্ছা খুড়োমশাই তুমি বাবুর ব্যবস্থা করে, আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাবে?

উমেশ বলিল—তার আর কথা কি? এই সন্মুখে অমাবস্যা,—সে দিন খুব ভাল দিন, কালীমায়ের পূজায় খুব প্রশস্ত, চল সেই দিন তোমাকে নিয়ে যাই, বাবুকে জমাদার ও ঠাকুরের কাছে রেখে দুপুর বেলা যাব, আর সন্ধ্যে হতে না হতে ফিরে আস্‌বো—তবে তুমি মালতীকে সঙ্গে নিও, তোমার সঙ্গে একজন মেয়ে মানুষ ত থাকা চাই?

তিরোলময়ীর শরণাপন্ন হওয়াই স্থির হইল, এই পাগ্‌লা কালীমার পদে পুজা দিয়া অনেক পাগল ভাল হইয়াছে, জাহানাবাদ হইতে ইহা বেশী দূর নহে। গৌরীদেবী মালতীকে বলিলেন, সে তাঁহার কাকুতি মিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—গৌরী দিদি! আমাকে অত করে বল্‌তে হবে কেন? জামাই বাবুর ব্যারাম সেরে যাবে, আমি ত তাই বল্‌তেই আজ এসেছি; পাগলা কালীর বালা পোরে অনেক দুর্দ্দান্ত পাগল ভাল হয়ে গেছে, এর জন্য আর বেশী কথা বল্‌তে হবে না, সব ঠিক কর—আমাবস্যার দিন যাওয়া যাবে।

একখানি গোযানের ব্যবস্থা হইল। উমেশ ভাড়ারী সমস্ত বন্দোবস্ত

করিয়া ঐ দিন গৌরীদেবীকে লইয়া তিরোলময়ীর প্রসাদ লাভ করিতে 'তিরোল গ্রামে যাত্রা করিল। গোযানে দুইজন স্ত্রীলোক আর উমেশ সাক্ষাৎ কালান্তক যমের মত লাঠি হাতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যথা সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হইয়া গৌরীদেবী মায়ের পূজা দিলেন—সেই ভীমাভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কত কাঁদিলেন। দেবী ভগবতী পতিপ্রাণা গৌরী কাতর প্রার্থনা শুনিলেন। পুরোহিত মহাশয় প্রাণ খুলিয়া দেবীর পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া একগাছী লৌহনির্ম্মিত বালা গৌরী হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন—মা! চিন্তা করিও না, ইহাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, গৌরী প্রণতা হইয়া ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। উমেশ ইতি পূর্ব্বে গৌরীদেবীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, পুরোহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিলেন—মা! বাবু খুব ভাল লোক, গরীবের মা বাপ, কোন মন্দ লোকে মন্দ করিয়াছে, যাহা হউক কোন চিন্তা নাই এই বালা ধারণ মাত্রেই ফল পাইবেন, মনে কোন দ্বিধা করিবেন না।

গৌরী এ কয়দিন মায়ের পূজায় হৃদয় মধ্যে খুব সাহস পাইয়াছিলেন —আজ পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ এবং লোলরসনা ভগবতীর সেই অট্ট হাসির মধ্যে প্রসন্নভাব দেখিয়া প্রফুল্লিত প্রাণে বাসায় ফিরিলেন।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, তায় সন্ধ্যার সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। গোযানের ছই ভিজিয়া ভিতরে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। গৌরীদেবী সমস্ত দিন জল স্পর্শ করেন নাই—স্বামীর হাতে বালা পরাইয়া তবে জল খাইবেন।

শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি স্বামীর জন্য এ অবসন্নতা তাঁহার গ্রাহের মধ্যেই আসিল না। তবে দারুণ দুর্যোগ্য উপস্থিত হইল, গাড়ী যাইতে বিলম্ব হইতেছে, সমস্ত দিন রুগ্ন পতির অদর্শন। অনাহারে যত কষ্ট হউক না হউক—ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত অস্থির করিয়া ফেলিল—তিনি উমেশকে বলিতে লাগিলেন—কাকা, আর কত দূর!

উমেশ বলিল—মা, আর বেশী দূর নাই—কালীপুরের বন্দরে আসিয়া গাড়ী পড়িয়াছে, এইবার নামিয়া দ্বারুকেশ্বর নদীতে স্নান করিয়া চল বাড়ী যাই, ঘোর অন্ধকার বটে কিন্তু বৃষ্টি থামিয়াছে। মালতী বন্দরে নামিয়া তাহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে চলিয়া গেল।

গৌরীদেবী যানাবরোহন করিয়া নদীতে স্নান করিলেন, রাত্রি বেশী হয় নাই তবে সূচীভেদ্য অন্ধকার নিকটের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়না। গৌরী ঘাটে উঠিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন; স্বামীর জন্য এই অসহ্য কষ্ট তিনি হাসিমুখে সহ্য করিতেছেন। কোমলাঙ্গী কুলকামিনী গৌরীর প্রাণ সাহসবদ্ধ, কারণ পুরোহিত বলিয়া দিয়াছেন—এই ঔষধে তাঁহার প্রাণপতির রোগমুক্তি হইবে।

দারুণ অন্ধকারে আলোক নাই, এইজন্য উমেশ তাঁহাকে আর্দ্রবস্ত্র মোচন করিতে বলিয়া আলোক সংগ্রহ করিতে নিকটবর্ত্তী একটী দোকানে গমন করিয়াছে। এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে হটাৎ কে আসিয়া গৌরীর মুখ বন্ধ করিল—গৌরী চিৎকার করিতে পারিলেন না, পাষণ্ড তাঁহাকে যেমন টানিয়া বাহির করিবে—অমনি কোথা হইতে একটী ভীষণ লাঠির আঘাত খাইয়া সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে উমেশ আসিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিলে আঘাতকারী অন্ধকারে

মিশিয়া যাইবার সময় অভয় দিয়া বলিল—ভয় নাই, তোমরা গৃহে গমন কর, পাযণ্ডের সমুচিত শাস্তি দিয়াছি। অন্ধকারে গৌরীদেবী সেই মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন—কোন গৈরীকধারী সন্ন্যাসীমূর্ত্তি তাঁহার এই বিপদে লজ্জা নিবারণ করিলেন। তিনি উদ্দেশে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—কাকা, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে চল আর দেরী করা ভাল নয়, সমস্ত দিন তাঁর বড় কষ্ট হইতেছে।

গোলমাল শুনিয়া বন্দরের দোকানদারগণ আসিয়া পড়িয়াছিল—তারা বড় হাকিমের পত্নী জানিয়া শশব্যস্তে অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী অবধি রাখিয়া আসিল। গৌরীদেবী গাড়ী হইতে নামিয়া প্রাণেঁর আবেগে একেবারে স্বামীর শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিলেন—তোমার আজকার মাথার যন্ত্রণা কেমন আছে?

এমনি দেবীর কৃপা সেদিন রমণীমোহন অন্য দিন অপেক্ষা খুব ভাল আছেন। তিরোলময়ীর মন্দিরে পূজা দিবার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে পত্নীকে সেইরূপ বিপন্ন অবস্থায় ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া রাগিয়া বলিলেন—দেখ, তোমার কি প্রাণের ভয় নেই—তুমি যেরূপ উতলা হয়েছো, যেন আমার কত অসুখ, তুমি এমন করে কার হুকুমে একাকী এতদূর গিয়াছিলে?

বহুদিন হইল গৌরীদেবী স্বামীর এমন জ্ঞানের কথা শুনেন না; সমস্ত দিন পাগলের ন্যায় বসিয়া আপনার মনে কত কি বকিতেন। আজ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মনে মনে দেবীর পদে প্রণাম করিয়া বালা পরাইয়া দিলেন, এবং অবনত মস্তকে স্বামীর কয়েকটা তিরস্কার বাক্য সহ্য

করিলেন। তারপর প্রাত্যহিক পূজা-পাঠ সমাপন করিয়া জল গ্রহণ করিলেন।

দৈবের কি আশ্চর্য্য মহিমা, মা তিরোলময়ীর কি অলৌকিক শক্তি! বালা ধারণ করিবামাত্রই রমণীর সে আবেশভাব একেবারে কাটিয়া গেল, পূর্ব্বের মত সহজভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে, বেড়াইতে লাগিলেন—দেখিয়া গৌরীর প্রাণ আনন্দে আটুখানা হইয়া গেল। জাগ্রতা তিরোল-ময়ীর প্রভাব দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে বার বার তাঁহার পদে মন প্রাণ ঢালিয়া প্রণাম করিলেন।

২৯

"বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা" দৈবের প্রকোপে পড়িলে শান্তি-শস্ত্যয়নে, পূজা-আরাধনে তাঁহাকে প্রসন্ন করা যায় কিন্তু মানুষের প্রকোপে পড়িলে সহজে নিস্তার নাই। বাঘে কামড়াইলে কত প্রকার কষ্ট যে সহ্য করিতে হয়—তাহার ইয়ত্তা করে কে? গৌরীর বিশ্বাস সেদিন গার্ডেন পার্টী হইতেই তাঁহার স্বামীর প্রতি কে বিষবাণ হানিয়াছে; কিন্তু ডাক্তার যখন বলিতেছেন—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই এই শারীরিক দুর্ব্বলতার হেতু, রমণীমোহনকে এতাদৃশ বিকৃত মস্তিষ্ক করিয়াছে, তখন আর যাহার তাহার কথায় বিশ্বাস কি? বিশেষতঃ প্রভাস তাঁহার বাল্যবন্ধু, তাহার দ্বারা কি এ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে?

যাহা হউক মা তিরোলময়ীর কৃপায় রমণীমোহনের মস্তিষ্ক বিকৃতি সারিয়া গিয়াছে কিন্তু এই যে ঘুস্ ঘুসে্ জ্বর ত নাড়ী ছাড়া হয় না, ইহাই

ত বিপদের কথা ; ডাক্তার বলিতেছেন—থাইসিসের পূর্ব্ব লক্ষণ, অতএব এই সময় বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে রোগ আর বাড়িতে পারিবে না। ডাক্তারের পরামর্শে রমণীমোহন প্রথমতঃ ছুটী লইয়া দেশে আসিলেন। স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিতে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। রমণীর ললিত ললাম সুন্দর শরীর ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ কলিমাময় হইয়াছে, পাড়ার লোক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইল, তথাপি আশ্বাস দিয়া বলিল—ভয় কি, যখন চিকিৎসা হইতেছে, রোগ ধরা পড়িয়াছে, তখন সাবধানে থাকিলে নিশ্চয়ই আরাম হইবে, রমণী তুমি ভেবো না, তোমার মত পরোপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট কিছুতেই হইবে না।

ভগীর মা এতদিন তাহাদের বাড়ী আগুলিয়া ছিল, আজ তাহাদের জিনিস তাহাদের বুঝাইয়া দিল। গৌরী বলিলেন—দিদিমা! আর ঘর-সংসার আমার কি হবে? যাঁকে নিয়ে ঘর, যিনি ঘরের সর্ব্বস্ব—তিনিই যখন শয্যাগত হয়ে রইলেন, তখন আর ঘরের সুখ-শয়ালে দরকার কি মা! তুমি যেমন ছিলে সেই রকমই থাক—আমরা এখন কোথা থাকি, কোথা যাই, তার ঠিক কি?

ভগীর মাও রমণীর শ্রীহীন দেহ, রক্তহীন বদনমণ্ডল দেখিয়া বড়ই দুঃখিত স্বরে বলিলেন—তাইত মা! অমন সোণার দেহ এই কয় মাসে এমন কালী হয়ে গেছে, তাইত কি হবে? তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভাল করে ডাক্তার দেখাও মা! রমণী আমার শীঘ্র ভাল হক, ওযে অনেকের প্রাণ! ভগীর মা কাঁদিয়া চক্ষের জল আঁচলে মুছিতে লাগিল।

সেই দিন হইতে চব্বিশপরগণার বড় ডাক্তার রমণীর চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। এক সপ্তাহ দেখিয়া তিনিও বলিলেন—বাস্তবিক

থাইসিস্ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই সময় বায়ু পরিবর্ত্তনে বিশেষ ফল হইবে। বিলম্বে রোগ বাড়িয়া যাইতে পারে, অতএব রমণীবাবু আর আপনি কালবিলম্ব করিবেন না। চাকর বামুন লইয়া কোন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে চলিয়া যান।

রমণীমোহন বিষম ভাবনায় পড়িলেন, সকল ডাক্তারেরই এক পরামর্শ—বায়ু পরিবর্ত্তন, কিন্তু তার উপায় কি? চাকুরীর উপায় আর নাই, অর্থাদি যাহা ছিল, এতদিন চিকিৎসায় তাহা নিঃশেষ হইয়াছে; গৌরীর অলঙ্কারাদিও সমস্ত বাঁধা পড়িয়াছে। তবে এখন উপায় কি? বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়ার খরচ ত সহজ নহে? রমণী জীর্ণ-শীর্ণ কলবর, উঠিবার ক্ষমতা নাই. তবে উমেশ ভাড়ারী এই বিপদে সাহস দিয়া বলিতেছে—বাবু! ভয় কি, আমি ঠিক কায়ার ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, এত বড় একটা মহৎ জীবন কি সহজে যাইবে, ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন না? উমেশের সেই আশ্বাস বাক্য এই দুঃসময়ে রমণী ও গৌরীর প্রাণে শত আশার সঞ্চার করিতেছে, কিন্তু কিছু টাকাত চাই!

রমণীমোহন পীড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন; মালতীও আর জাহানাবাদেনাই, কি জানি সেই দিন সন্ন্যাসীর ভয়ে সে বুঝি দেশ ত্যাগ করিয়াছে, কাজেই প্রভাস বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িল. গৌরীর আশা বোধ হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল, এত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া শেষে ফস্‌কাইয়া যাইবে—প্রভাস তাহা হইতে দিবে না। সে খুব বন্ধুভাবে, রমণীর পীড়ায় যেন কত কাতর ভাবে একদিন রুদ্রপুরে আসিল, রমণীর পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া বলিল,—ভাই! এর

জন্য আর ভাবনা কি ? আমার বৈদ্যনাথে বাড়ী আছে ; চাকর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রহিয়াছে, তুমি অনায়াসে সেখানে গিয়া থাকিতে পার ; আর টাকার অভাব বলিতেছ, আচ্ছা, আজ এই একশত টাকা লও, আবশ্যক হইলে আরও দিব। টাকার অভাবে কি তোমার মত একজন বাল্যবন্ধু বিঘোরে প্রাণ হারাইবে ? বলিয়া কয়েক খানি নোট বিছানার উপর রাখিল। ভগীর মাও গৌরী প্রভাস আসিবার পূর্ব্বে বিছানা ছাড়িয়া নীচে বসিয়াছিলেন। ভগীর মা টাকা গুলি বিছানা হইতে লইয়া গৌরীর হাতে দিল, গৌরী হাতে স্বর্গ পাইলেন, একশত টাকা এখন তাহার পক্ষে এক লক্ষ টাকার সমান, গৌরী পরমানন্দে অভিষিক্ত হইয়া বন্ধুর সেই অযাচিত দান বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

প্রভাস জিজ্ঞাসা করিল—তবে কোন্ দিন যাইবার দিন স্থির করিবে? ডাক্তার যখন বলিতেছেন তখন আর কাল বিলম্ব করা ত উচিত নয়। রমণী বলিলেন—যখন সমস্ত প্রস্তুত, তখন আর বিলম্ব কেন, কল্যই যাওয়া যাক্, কেবল উমেশ কাকা সঙ্গে যাইবে।

প্রভাস।—ভাল কথা, এ রোগে স্ত্রীলোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত. ডাক্তার ঠিক বলিয়াছিলেন—তবে কল্যই প্রাতের গাড়ীতে আমি তোমায় রাখিয়া আসিব ?

রমণী।—সেই ভাল ; তুমি সকালেই এসো, তোমার এ অযাচিত বদান্যতা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। ভাই প্রভাস ! বিপদে যে দেখে সেইত বন্ধু, তুমি যে আমার যথার্থ বন্ধু, এত দিনে তাহা বুঝিতে পারিলাম—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

প্রভাস বলিল—রমণী, সে জন্য তুমি এত কিন্তু হও না, মানুষ হয়ে

মানুষের এরূপ উপকার করেই থাকে, এতে আর নূতনত্ব কিছু নাই। বলিয়া প্রভাস সে দিনের মত বিদায় হইল।

৩০

বিদেশে যাওয়াই যখন ঠিক আর ভগবান যখন প্রভাসরূপ বন্ধুর দ্বারা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে কিন্তু স্বামীর পীড়িতাবস্থায় স্ত্রী সঙ্গে যাইতে পারিবে না, ডাক্তারের এ কিরূপ ব্যবস্থা? যাহারা মুর্খ অবিবেচক বুদ্ধিহীন অসংযমী, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু আমার ও আমার স্বামীর পক্ষে ডাক্তার একি ব্যবস্থা করিলেন? আমি এমন জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল দেহ স্বামীকে এত দূরদেশে একাকী ছাড়িয়া দিই কেমন করিয়া? গৌরীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামীর পীড়া হইয়া অবধি গৌরী জীবনধারণের মত এক বেলা খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, যদি তাহাতে কিছু সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে স্বামীর পথ্যের অনেক সাশ্রয় হইবে। আগামী কল্য প্রাণের ধনকে দূরদেশে পাঠাইতে হইবে ভাবিয়া আজ মধ্যাহ্নেও তাহার মুখে অন্ন রুচিল না, তিনি ভগীর মার অসাক্ষাতে তাহা গরুর ডাবায় দিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন, স্বহস্তে পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে গেলেন। আজ তাঁহার চক্ষের জল আর যেন চক্ষে আবদ্ধ থাকিতেছে না, তিনি যেন তাঁহাকে একাকী বৈদ্যনাথে পাঠাইতে নারাজ, তাই কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেই রোগ

জীর্ণ পাণ্ডুর হস্ত-পদে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—কি করা যায়, আমি একাকিনী তোমায় ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো ? সহজ অবস্থা হলে ত কথাই ছিল না, একাকী ত কতদিন দেশে কাটিয়েছি কিন্তু এ অবস্থায় তোমাকে একাকী পাঠাতে প্রাণের ভিতরটা যেন কেমন আন্‌চান্‌ কচ্ছে, কিছুতেই সুস্থ হতে পারছি না, বলিয়া গৌরী চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। গৌরী হেন স্নেহময়ী পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে রমণীর চক্ষেও জলধারা বহিতে লাগিল কিন্তু কি করিবেন—ডাক্তারের উপদেশ ত সামান্য করা চলে না ?

তিনি প্রাণের মায়ায় আত্ম সম্বরণ করিয়া নানা উপদেশচ্ছলে বলিলেন—বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাই উচিত গৌরী ! তোমাকে আর বেশী কি বলিব, যখন ডাক্তারের নিষেধ তখন উপায় নাই, তিনি হয়ত তোমায় আমায় অসংযমী মনে করিয়াছেন। যাহা হউক, ভয়ের বেশী কারণ নাই, যখন উমেশ কাকা সঙ্গে থাকিবে, তখন আমার যে কোন কষ্ট হবে না তা ঠিক, আর যদি একান্ত হয়, তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিলে তুমি ভগীর মাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রভাস যখন এত করিতেছে—তখন তাহার ভরসাও সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারা যায় !

গৌরীর মনে প্রভাসের উপর কোন সন্দেহ নাই, হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছে, তাই সাগ্রহে বলিলেন—নিশ্চয়ই কর্ত্তে পারা যায়, এ অসময়ে এতটা সাহায্য কে করে ? বলিয়া বৈকালে স্বামীকে ঔষধ ও পথ্য দিয়া গৌরী গৃহ কার্য্য সমাধা করিতে ভগীর মাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া বাহিরে আসিলেন।

মানুষের বিপদ কখন একাকী আসে না, দলবল লইয়াই সে দুঃখের

উপর দারুণ দুঃখে উৎপীড়িত করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড বিদারিত করিবার চেষ্টা করে। গৌরী কয়েক দিন হইল—পিতামাতাকে আসিতে পত্র লিখিয়াছেন। কলিকাতায় সে সময় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাই এ দুঃসময়ে কিছুদিন এখানে আসিয়া থাকিলে কথায় বার্ত্তায় পিতামাতার সাহস-সান্তনায় প্রাণে কতকটা শান্তি পাইবেন, বলিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জামাতার এরূপ অবস্থা শুনিলে তাঁহারাও কিছুতে স্থির থাকিতে পারিবেন না।

আজ সন্ধ্যার সময় পত্র পাইলেন, তথাকার ঠান্‌দি পত্র দিতেছেন—"তোমার পিতামাতা দুই জনে দারুণ কলেরায় আক্রান্ত চিকিৎসা হইতেছে অবস্থা এখনও তত মন্দ হয় নাই—কিন্তু যেরূপ দিন কাল তাহাতে মন্দ হইতে কতক্ষণ, তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, সেখানকার বন্দোবস্ত করিয়া অন্ততঃ একদিনের জন্য চলিয়া আসিবে।"

পত্র পাইয়া গৌরীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদিকে জনক জননীর স্নেহের অকর্ষণ, অসময়ে তাঁহাদের দর্শন, সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি কর্ত্তব্য সমাপন, আর একদিকে প্রণয়ের বন্ধন—ভক্তি প্রীতি ভালবাসার আকর্ষণ; পীড়িত স্বামীকে ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইবেন, তিনি যে আগামী কল্য দূরদেশে যাইবেন। গৌরী কোন দিক রাখিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পাছে স্বামী শুনিতে পান, এ অবস্থায় এই আকস্মিক বিপদ্ শুনিলে—তাঁহার রোগ বাড়িয়া যাইতে পারে, তাই গৌরী ভয়ে ভয়ে পাষাণে শক্তিশেলের মত সে বিষম সংবাদ চাপিয়া রাখিয়া অসাড় দেহে, যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার মত বৈকালিক

কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া দেবগৃহে পূজায় বসিলেন। মন তাঁর উড়ু উড়ু করিতেছে, প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতেছে পূজায় মন বসিবে কেমন করিয়া? তাইদেবতার পদে প্রতিপাত করিয়া বলিলেন—মনোময়! মনের ধন তুমি, কিন্তু আজ মন ত আমার মনের মধ্যে নাই সে যে নিদারুণ শোকের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হইয়া চারিদিকে ছুটা ছুটী করিতেছে, তোমার পূজায় বসিতে চায় না, ঠাকুর, আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, দুঃখে পড়িয়া যেন ধর্ম্মপথ ভুলিয়া না যাই!

সমস্ত কাজ সারিয়া গৌরী পুনরায় স্বামী সকাশে গিয়া বসিলেন পত্রের কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। প্রাণ ফাটিয়া যইলেও বাহিরে দুঃখের কোনও ভাব প্রকাশ করিলেন না। সময়ে সময়ে দারুণ দীর্ঘ নিশ্বাসে তাঁহার প্রাণে শোকের সাগর উথলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া রমণী মনে করিলেন—আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইবার জন্য বুঁঝি গৌরীর দীর্ঘ নিশ্বাস এত ঘন ঘন বহিতেছে!

রমণীর কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে—তথাপি পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—গৌরী, ভয় কি, আমি ভাল হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। গৌরী উদাস দৃষ্টিতে কেবল ফেল্ ফেল্ করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, চক্ষে অনবরত বারিধারা বহিয়া দর্শন শক্তির বাধা জন্মাইয়া দিতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে তাহা মুছিয়া ফেলিতেছেন কিন্তু তাহা কি আর থামে, হৃদয় ভাণ্ড যে ফাটিয়া গিয়াছে, উহাদের গতি রোধ করিবে কে?

সমস্ত রাত্রি এইরূপে কাটিল। কাহার নিদ্রা হইল না, চেষ্টা করিয়া কেহ ঘুমাইতে পারিলেন না, শোকে দুঃখে যাহাদের হৃদয় পূর্ণ, নিদ্রা

তাহাদের কোথায় ? প্রাতঃকাল হইল, এইবার প্রভাস আসিবে, গৌরী তাঁহার প্রাণের ধনকে দূরদেশ পাঠাইবে, পাছে স্বামী শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, এই জন্য তিনি প্রাণকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া বলিলেন—একাকী যাওয়াই যখন ডাক্তারের উপদেশ—তখন যাও, কোন চিন্তা করিও না। আমি যদি একমনে তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি ; অনন্য স্মরণ হইয়া তোমাতেই যদি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবার ক্ষমতা মা ভগবতী আমাকে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি বল্‌ছি আমার হাতের নোয়া আর সিঁতির সিন্দুর অক্ষয় হবে, শীঘ্রই তুমি রোগ মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য লাভ কর্ব্বে ! প্রতিদিন যেমন যেমন থাক্ উমেশকে দিয়ে একখানি করিয়া পত্র দিবে, আমার মাথার দিব্য, প্রাণ তোমার সঙ্গে চলিল, ধড়টা শূন্যে রহিল, আশা বায়ু পেয়ে যেন নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে, এই করো বলিয়া সতী স্বামীর পদধূলি লইলেন। তার পর প্রভাস আসিলে রমণী উমেশ ভাড়ারীকে সঙ্গে করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গাড়ীতে উঠিলেন।

গৌরীর প্রাণ দৃঢ় হইয়াছে, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ীতে চাবি দিয়া ভগীর মায়ের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া যাহা শুনিলেন— তাহাতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পিতামাতা একযোগে কল্য রজনীতেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ! দাহ করিবার কেহ ছিল না, একজন সন্ন্যাসী প্রভাবতীর দেহ পতিতপাবণী গঙ্গা সলিলে ভাসাইয়া দিয়া বলিয়াছে—"যে আজীবন বিষ্ণুসেবা করিয়াছে— অন্তিমে।বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাই তাহার চিরবিশ্রাম স্থান, এতদিনে তাহার বিষ্ণুসেবা সার্থক হইল।" অনাথের শবও সেই সঙ্গে বিসর্জ্জিত

হইয়াছে। গৌরী আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠান্‌দি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, কিছুদিন পরে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। রমণীর অকস্মাৎ দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জলধারা প্রবাহিত হইল।

৩১

আশাতরুতে সুফল ফলিবার উপক্রম হইয়াছে। রমণী বোধ হয় আর এ যাত্রা ফিরিবে না, তাই প্রভাস উৎফুল্ল হৃদয়ে তাহাকে বৈদ্যনাথে রাখিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে ফিরিয়াছে, এইবার নানা প্রলোভনে গৌরীকে হস্তগত করিতে আর তাহার কষ্ট হইবে না।

এ সময় হতভাগী মালতী গেল কোথায়—সে মলো নাকি, না ভয়ে ভয়ে সেদিন সন্ন্যাসীটের সঙ্গে ভেক নিলে? হায় হায় সেদিন ঠিক বাগিয়ে ধরেছিলাম—সন্ন্যাসীবেটা যদি হাতে লাঠির ঘা না মারতো—তাহলে এত দিন গৌরী সম্ভোগ আর বাকী থাকৃতো না। ভগবান যা করেন—ভালোর জন্য, সে ক্ষণিক সুখে আর সুখ নষ্ট করে কি হতো, তাই একটু কষ্ট দিয়ে চিরসুখের অধিকারী কল্লেন, কষ্ট না কল্লে কি কৃষ্ণ পায়—আশা কি সহজে ফলবতী হয়? চেষ্টা সলিল অনবরত না ঢাললে কি ফল হয়? এইবার আশাবৃক্ষ মঞ্জুরিত—তাই ফলের আশা হয়েছে, এ সময় হতভাগী মালতী থাকৃলে সাম্‌নে যে একটা বাধবাধ ভাব, তা সহজেই সেরে যেতো—"স্বকার্য্য সাধয়েৎ প্রাজ্ঞ"—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই রকমেই স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান হয়।

গৌরী কলিকাতা হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দিন

যে কেমন করিয়া যাইতেছে—তাহা ভগবানই জানেন। হটাৎ পিতামাত. মারা গেলেন,তাঁহাদের সহিত শেষ দেখা হইল না ; তারপর স্বামী আজ ২।৩ দিন গিয়াছেন, কই একখানিও পত্র ত দিলেন না সতী শোকে দুঃখে ঠিক মৃত কল্প হইয়া আছেন। ভগীর মা বলিতেছেন—বউমা ! যাহা হবার তাত হয়েছে, এখন রমণীর একখানা পত্র এলেই হয়, তা বাবু ! এত উতলা হলেই বা চল্‌বে কেন, সে ত সুস্থ শরীরে নাই যে যাবা মাত্রই পত্র লিখিবে ?

গৌরী বলিলেন—না তাঁর ত ক্ষমতা নাই কিন্তু উমেশ কাকা ত না হয় তা করে একটা পৌছান সংবাদ দিতে পারে।

ভগীর মা। হাঁ তা পারে, তবে সেও ত রোগীর সঙ্গে আছে, এই আসে আর কি, হয় আজ না হয় কাল আর পত্র পেতে বাকী থাক্‌বে না।

এই বলিয়া উভয়ে সে রাত্রি একপ্রকার বহুকষ্টে ছটফট্ করিয়া কাটাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালেই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত—গৌরী শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন—ভগীর মার দ্বারা স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভাস বলিল—তাহারা ভালোয় ভালোয় পৌছিয়াছে, তবে দুই এক সপ্তাহ না গেলে আর ভাল-মন্দ কেমন করিয়া বুঝা যাইবে। আমার এখানে নানা কাজ, তাই বাধ্য হয়ে চলে এসেছি।

প্রভাস যাহা করিতেছে—তাহার আর তুলনা নাই। তাই গৌরী ভগীর মার দ্বারা বলাইলেন—আজ আর বাসায় যাইয়া কাজ নাই, এই খানেই আহারাদি করুন। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য গৌরী আন্তরিক ভালবাসা জ্ঞাপন করিলেন।

একেবারে এতটা হইবে—প্রভাস তাহা মনে করে নাই। সেও এই চায়, তাই বলিল—বাসায় বামুন রান্না ভাত খেয়ে ত তৃপ্তি হয় না, দোকানের জলখাবার খেয়েই কাটাতে হয়, কাজ-কর্ম্ম পড়লে ত আর উপায় নাই। আজ যদি ভগবান ভাল মাপিয়েছেন, তবে তাই হউক। প্রভাস মনোগত ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল, গৌরী ভগীর মাকে তাহার স্নানের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া বহুকষ্টে রান্নাঘরে গেলেন।

এসময় তাঁহার রাঁধিতে হাত উঠে না, তবে পরোপকারী প্রভাসের অভ্যর্থনা এখন তাঁহার প্রধান কার্য্য, তিনি কিছু অধিকক্ষণ থাকিলে স্বামীর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনা যাইবে—ভাবিয়া অতি কষ্টে গৌরী তাহার আতিথ্য সৎকারে ব্রতী হইলেন।

মধ্যাহ্নে আহারাদি হইল। খেতে পেলে শুতে চায়, আহারাদির পর দারুণ রৌদ্রে প্রভাস একটু গা ঢালিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন। বড় লোকের ছেলে এতটা পথ আমাদের জন্য হাঁটিয়া আসিয়াছেন—আহারের পর একটু অবসাদ আসিতে পারে, গৌরী দুতলার ঘর খুলিয়া দিলেন—প্রভাস বিশ্রাম করিতে লাগিল কিন্তু বিশ্রাম তার কোথায়? সে কেবল দেখিতে লাগিল—ভগীর মা কখন একটু সরিয়া যায়। গৌরীর খাইলেও হয়, না খাইলেও হয়, তবে ভগীরমার তাড়নায় একবার মাত্র বসিলেন, পঞ্চগ্রাস করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ভগীর মা আহারাদির পর কয়েকটা দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব প্রযুক্ত নিকটবর্ত্তী দোকানে গেল। গৌরী নীচে একটা ঘরে প্রাণ-ফাটা দুঃখ বুকে করিয়া মেঝের আঁচল পাতিয়া শুইয়া ভাবিতেছে, আর দুই চক্ষে বসুধারা বহিতেছে, হায়! জীবন মধ্যাহ্নে আমার ভাগ্য-গগন কেন

এমন কুয়াশাচ্ছন্ন হইতেছে, স্বামী ত আমার ধার্ম্মিক চূড়ামণী আর আমি ত মনে-জ্ঞানে তাঁর পদ সেবা ছাড়া আর অন্য কামনা করি না—তবে এত কষ্ট কেন দিতেছ ঠাকুর! মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় প্রভাস নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল—দেখ গৌরী! রমণীমোহন আমাকে বলে দিয়েছে, গৌরীকে দেখো, সে যেন ভেবে ভেবে মারা না যায়! তোমার চিন্ত কি গৌরী, আমি থাকিতে—"এই বলিয়া সে একেবারে গৌরীর মাথার কাছে আসিয়া বসিল।

কালফণী দংশন করিতে আসিলে, মানুষ যেমন ভয়ে সাত হাত লাফাইয়া যায়—নিরাশ্রয়া গৌরী প্রভাসকে মাথার কাছে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সরিয়া বসিলেন—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ইহার অভিপ্রায় কি; কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে কি কেহ সহসা পরস্ত্রীর মাথার কাছে আসিয়া বসিতে পারে? কিন্তু গৌরী তখনও কোন মন্দ কথা বলিলেন না, সাহসে ভর করিয়া কথা কহিয়া বলিলেন—আপনি যাহা করিয়াছেন—তাহার তুলনা নাই। এক্ষণে যাহাতে তিনি ভাল হন, তাহার চেষ্টা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন, তিনি ভাল হইলে আমার শরীরে আর কোন অসুখ থাকিবে না। নতুবা যে যতই করুক, আমার সুখের আশা আর নাই।

কিরাত জানায় মাঝারে শীকার পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, প্রভাস নির্জ্জন গৃহে সেইরূপ রূপবতী ভগবতী স্বরূপা গৌরীকে পাইয়া আনন্দে আর থাকিতে পারিল না—"সে কি ভাই! বৃথায় ভেবে ভেবে অমন অমূল্য জীবন, অমন যৌবনটা কেন নষ্ট কর? রমণী বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না, তখন তুমি এমন অমূল্য জীবনটা কেবল কেঁদে কেটে কাটাবে,

না খেতে পেয়ে মারা যাবে? রমণী জেনে শুনেই তোমাকে দেখ্তে বলেছে, এখন তোমার কি অভাব সমস্ত খুলে বলো। বলিয়া প্রভাস আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল।

গতিক ভাল নয় দেখিয়া গৌরী সাহসে ভর করিয়া, আপনার প্রতিভা সম্পন্ন মনে উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া আত্মরক্ষার্থ বলিলেন—ছিঃ প্রভাস বাবু! এত বড় লোক হইয়া তোমার চোরের মত এ প্রবৃত্তি কেন? তুমি ত বুঝিয়াছ যে আমার স্বামীর জীবন বেশী দিন নয়, তবে কিছুদিন অপেক্ষা কর না। প্রাণে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে জোর করিয়া কি এ কাজ হয়—বিশেষতঃ কয়েক দিন হইল, হঠাৎ আমার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে, এ কি সুখের সময়! এই বলিয়া পত্রখানি ফেলিয়া দিলেন। প্রভাস পত্র পাঠ করিয়া বলিল—তবে কি তুমি কলিকাতায় গিয়াছিলে?

গৌরী।—হাঁ, পত্র পাইয়া গিয়াছিলাম, কাল আসিয়াছি; দেখছো ত প্রভাস, একে একে সকল বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে, তাই বলি—কয়েক দিন অপেক্ষা কর, সবুরে মেওয়া ফলিবে। প্রভাস আনন্দে এক গাল হাসি হাসিয়া বলিল,—দেখ, গৌরী! তুমি নেক্‌নজর করিলেই হলো, দু একদিন দেরীতে আর যায় আসে কি? তবে কি জান তোমার সুখ-সুবিধা বিধাতা আমার হাতেই দিয়েছেন। অমৃত কখন বায়সের ভাগ্যে ভোগ হইতে পারে না।

প্রভাসের কথা শুনিয়া গৌরী রাগে কাঁপিতেছিলেন, ইচ্ছা করিতে-ছিলেন—এক পদাঘাতেই তাহার বদন বিগ্‌ড়াইয়া দেন কিন্তু একাকিনী দুর্ব্বলা রমণী, গৃহে আর কেহ নাই। এ সময় হটকারিতার বশবর্ত্তিনী হইলে প্রবল বলশালী প্রভাস হয়ত জোর করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট

করিতে পারে, তাই নিজ প্রতিভাবলে তাহাকে সে যাত্রা নিরস্ত করিলেন।

প্রভাস পুনরায় বলিল—কত দিনে দয়া করিবে গৌরী! জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়াছে, আশার আশ্বাসে আর কত কাল থাকিব? রমণীর সহিত আমার যে এত বন্ধুত্ব সে কেবল তোমার জন্যই জানিবে, আমি বাল্যকাল হইতেই তোমাকে কিরূপ ভালবাসি তাহা কি তুমি জান না? তোমাকে পাইবার জন্য আমি বিবাহ পর্য্যন্ত করি নাই।

গৌরী মনে মনে প্রভাসের পোড়ার মুখে ছাই দিতে দিতে প্রকাশ্যে বলিলেন,—দেখ প্রভাস বাবু! এখানে এ কাজ কিছুতেই হইবে না। তিনি যখন বিদেশে গিয়াছেন, তখন সেইখানে আমাদের যাইতে হইবে। তিনি শক্তিহীন শয্যাগত, তাঁহার সেবা করিব—অথচ সেই নিভৃত নিবাসেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব, ইহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। মনে করিলেন—দেবতার সম্মুখেই পশুবলির সুবিধা হইবে, যদি তাঁর অবস্থা ভাল দেখি, তাহা হইলে তোমার বলিই বিশেষ প্রয়োজন, আর যদি দেখি, কপাল ভাঙ্গিয়াছে—তাহা হইলে আত্ম বলিদান দিয়া সকল জ্বালা ঘুচাইব। পাষণ্ড প্রভাস! সাধ্বী সতী প্রভাবতীর সুশিক্ষায় শিক্ষিতা আদরিণী কন্যা প্রাণ থাকিতে কখন সতীত্ব বিসর্জ্জন দিবে না। কল্য বৈদ্যনাথ যাইব, এইরূপ আশা দিয়া গৌরী প্রভাসকে বিদায় দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগীর মা গৃহে আসিল।

তিনি ভগীর মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং রজনী প্রভাতেই তাহাকে বৈদ্যনাথ লইয়া যাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে, পাড়ার সকলে নিষেধ করিল কাহার কথা মানিলেন না, তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

ক্ষণে ক্ষণে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। রাহা খরচের জন্য পাড়া হইতে কিছু টাকা লইলেন, এবং বলিয়া গেলেন—আবশ্যক হইলে আরও কিছু পাঠাইয়া দিও।

প্রভাসের যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গৌরী যখন কোন বাধাই মানিল না, তখন প্রভাস বলিল—ভগীর মাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল, প্রভাসের মুখে এই আশ্বাস বাণী শুনিয়া গৌরীদেবী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সরল প্রাণা গৌরী ভাবিতে লাগিলেন—সর্প কখন ক্রুর স্বভাব ছাড়িতে পারে না, পতনে পাইলেই সে হিংসা করিবে, হিংসাই তাহার স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম!

পরদিন সকলে বৈদ্যনাথ রওনা হইল—সমস্ত রাত্রির পর প্রভাত সময়ে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে পৌছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রভাস গৌরীকে বিশ্রাম কামরায় যাইতে বলিল এবং রমণীমোহনের জন্য কতকগুলি জিনিস কিনিয়া ভগীর মাকে একস্থানে তাহা গুছাইতে বলিয়া সে সেই গৃহে প্রবেশ করতঃ বলিল—গৌরী, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না—দেখ আমি অধৈর্য্য হইয়াছি, আজীবন তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি; তোমার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া অবধি আমি তোমায় ভুলিতে পারি নাই—তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া চির দরিদ্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছ—কিন্তু আমি তোমার জন্য চির কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার সে অভাব পূর্ণ না করিলে আমি জোর করিয়া তাহা পুরণ করিব, তোমাকে রক্ষা করিবার কে আছে বল? রমণীর জীবনের আশা নাই, সে এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না, তবে কেন

এমন অমূল্য জীবন হেলায় হারাবে, তার চেয়ে আমার প্রতি কৃপা করিয়া রাজরাণীর মত সুখ সম্ভোগ কর।

মাথায় বজ্রাঘাত হইলে গৌরী এরূপ ভীত হইতেন না, প্রভাসের কথায় এবং তাহার অসহায় অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে মা ভগবতীকে স্মরণ করিয়া উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না, আদর্শ সতী প্রতিভাময়ী গৌরী বলিলেন—দেখ প্রভাসবাবু! স্বামীর জীবনে আমি বহুদিন হতাশ হয়েছি, তবে পাড়ায় লোকত ধর্ম্মতঃ একটা চরিত্র বজায় রাখিতে হয় বলে, আমি এতদিন তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু যে দিন জনক জননী মারা গেলেন, সেই দিন হইতে আমি নিরাশ্রয়া জানিয়া তোমাকেই আশ্রয় করিব—ইহা স্থির নিশ্চয়, সেদিন তোমাকে প্রত্যাখান করিয়া ভাল করি নাই বলিয়া দুঃখ হইয়াছে—এই জন্য তোমার সঙ্গে বৈদ্যনাথে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখানে তোমার বাড়ী ঘর আছে; ইহা আমাদের দেশেও নয়—যে লোক দুষিবে, স্বামী ত মৃতকল্প পড়িয়াই থাকিবেন—এখানে আমাদের মিলনে বাধা হইবে না, তবে সমস্ত রাত্রি পরিশ্রমের পর এই প্রভাত সময়ে এ কার্য্যে সুখ হইবে না, এ সমস্তত সুখেরই নিদান, এমন অসময়ে আর কেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর না?

প্রভাস গৌরীকথায় মুগ্ধ হইল আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বলিল—তা যদি মনে করিয়া থাক—তা ভাল কথা, তবে চল, আমরা রমণীর নিকট গমন করি, সে কেমন আছে দেখি। প্রভাস গাড়ী ডাকিয়া তাহাদের লইয়া দেওঘর অভিমুখে যাত্রা করিল। যখন দেওঘরের কাষ্টার টাউনে প্রভাসের বাড়ীতে তাহারা উপস্থিত হইল—তখন সূর্য্যোদয় হইয়া গিয়াছে।

৩২

গৌরী গাড়ী হইতে নামিয়া ভগীরমার সহিত প্রভাসের বাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি এঘর সেঘর করিয়া যে ঘরে রমণীমোহন খাটের উপর মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, ছুটিয়া গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীর সেই কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাষণ্ড যাহা বলিয়াছে, তাহা ত সত্যই আর কিছুদিন স্তোকবাক্যে ভুলিয়া থাকিলেই ত সর্ব্বনাশ হইত! দেহ যে বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, হে বাবা বৈদ্যনাথ, তুমি কি করিলে—আমার প্রাণের ধনকে এইরূপ করিয়া কষ্ট দিতেছ কেন, ঠাকুর!

রমণীমোহন কথা কহিতে অশক্ত, চব্বিশ ঘণ্টা, চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছেন, সেই কোঠর গত চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। গৌরী আর থাকিতে পারিলেন না, উন্মাদিনীর ন্যায় শয্যার পার্শ্বে গমন করিয়া বহু বেষ্টনে আবরণ করিয়া ডাকিলেন—দাসী, আমি এসেছি, এখন তুমি কেমন আছ! গৌরী চখের জল আর রাখিতে পারিলেন না, আপনা হইতে গণ্ড বহিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল! রমণীমোহন ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। বহুদিন পরে অপহৃত প্রিয় বস্তু দর্শনে যেমন প্রাণের একটা তীব্র আগ্রহ হয়, রমণীমোহন সেইরূপ কোঠরগত চক্ষুর ক্যাল্ ক্যাল্ চাহনীতে চাহিয়া বলিলেন—গৌরী তুমি এসেছ! আর কিছুদিন পরে আসিলে বোধ হয় দেখা হইত না, আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ

হইতেছে, দেখিয়া আজ তোমাকে আনিবার জন্য উমেশ কাকাকে পাঠাইয়াছি, তুমি কি তাহার সঙ্গে আসিলে ?

গৌরী বলিলেন—না, ভগীর মার সহিত প্রভাসবাবু আমাকে আনিয়াছে।

রমণী।—গৌরী, প্রভাসের ঋণ আমরা জীবনে শুধিতে পারিব না, এ সময়ে ভগবান তাহাকে দয়া করিয়া জুটাইয়া দিয়াছেন। অবস্থা বুঝিয়া সে যখন তোমাকে আনিয়াছে, তখন আর ভয় নাই, তুমি কাপড় ছাড়িয়া কিছু জল খাও।

সমস্ত রাত্রি অনাহার, স্বামীর আদেশে গৌরী বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মনে মনে শিবপূজা করত কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। পরে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে করিতে প্রভাস সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। শুনিয়া রমণীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি পীড়িত, একরূপ মৃত্যুমুখে পতিত বলিলেই হয়—এমন সময় বন্ধু হইয়া প্রভাস তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, মুখে এত অনুকম্পা, হৃদয়ে এত গরল ! অবস্থার ফেরে পড়িয়া ভীত চকিত ভাবে রমণী বলিলেন—গৌরী, আমার ত এই অবস্থা, তুমি কেমন করিয়া তবে আত্মরক্ষা করিবে ?

গৌরী। স্বামিন্ ! এতদিন ভয় ছিল, এখন আর তাহা নাই—স্বামীর সন্মুখে সতীনারী অসাধ্য সাধন করিতে পারে ; মৃত পতিকে কোলে লইয়া সতীকুলসীমন্তিণী সাবিত্রী একদিন কৃতান্তকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আর আমি জীবিত পতির পদতলে বসিয়া একটা পাষণ্ড, নরপশু লম্পটকে পদদলিত করিতে পারিব না ?

বন্ধুরূপী সয়তান প্রভাসের ব্যবহার দেখিয়া রমণীমোহনের অন্তরাত্মা

শুকাইয়া গিয়াছে। সে অর্থ ও সামর্থ্যে এখন বলবান—ইচ্ছা করিলে সে সমস্ত পাপ কাজই করিতে পারে, হায় হায়! পাষণ্ড এই জন্যই বুঝি এতদিন এরূপ আন্তরিকতা দেখাইয়াছিল, আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বুঝি তাহার মৌখিক এত সখ্যতা! ভগবান, দুর্ব্বলের বল তুমি; আমার জীবন গ্রহণ কর তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু কুলললনা গৌরীর মান-সম্ভ্রম এ অবস্থায় তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে জগদীশ! বিপদের কাণ্ডারী শ্রীমধুসূদন রক্ষা কর! রমণীমোহন দুর্ব্বল দেহে অতিরিক্ত দুঃখে ও ক্ষোভে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুমি করছো কি, একি ছেলের হাতে মোয়া, যে কাড়িয়া খাইয়া ফেলিবে? আমাদের অপেক্ষা কত নিরাশ্রয় তরুতলবাসী রহিয়াছে—ভগবানের রাজত্বে কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না—তবে তুমি ভাবছো কেন? স্থির হও, পাষণ্ড যেন জানিতে না পারে যে আমি তাঁহার সমস্ত চক্রান্ত তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইলে প্রথম হইতে সাবধান হইয়া হয়ত সদল বলে সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। অতএব বিচলিত হইও না, বিপদে ধৈর্য্যধারণ কর, দেখই না তাহার শক্রতা সাধনের আকাঙ্খাটা কিরূপভাবে সংক্রামিত হয়!

রমণীমোহন আর কিছু বলিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন—হৃদয়ের মধ্যে তার প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

শীকার হস্তচ্যুত না হয় ভাবিয়া প্রভাস গৌরীকে লইয়া তাড়াতাড়ি এখানে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার প্রাণের চিরবাঞ্ছিত নেশার দ্রব্যাদি কিছুই আনিতে পারেন নাই, সমস্ত রাত্রি প্রতি ষ্টেশনে কিছু কিছু

গলাধিকরণ করিলেও তাহাতে প্রাণের শান্তি হয় নাই। তাই গাড়ী হইতে নামিয়াই সে হোটেলের দিকে ছুটিয়াছে। আজ তাহার বড় আনন্দের দিন, এতদিন পানপাত্রে আন্তরিকতার সহিত মজিয়া যে সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল, আজ তাহাতে সিদ্ধি লাভের দিন উপস্থিত হইয়াছে; সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রসন্ন হইয়া আশা দিয়াছেন—তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন, তাই আজ প্রভাস প্রাণের আবেগে শক্তি সাধনার প্রধান অবলম্বন আসব আবেশে আপনাকে সুদৃঢ় করিতেছে। হোটেল হইতে কয়েক বোতল সুরা আনিয়া বৈঠকখানায় রাখিয়া প্রায় এক বোতল উদরস্থ করিল।

গৌরী গৃহে প্রবেশ করিয়া অবধি আর স্বামীর কাছ ছাড়া হন নাই; রথী যেমন যুদ্ধে প্রস্তুত হয়, গৌরীও তেমনি স্বামী-সেবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্বামীর আহারের সময় হইয়াছে দেখিয়া সতী দুধ-সাগু লইয়া গরম করিতে লাগিলেন।

স্মর স্মরজাল বিদ্ধ পাষণ্ড কামাতুর পশু উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া ঠিক সেই সময়ে হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করিল। মনে করিয়াছিল, ভগীর মার দ্বারা গৌরীকে ডাকাইয়া আনিবে কিন্তু সে তখন দেবতা দর্শনে গিয়াছে; তাই অধৈর্য্যভাবে আসিয়া প্রথমে রমণীমোহনের শয্যা পার্শ্বে বসিল, সুরাবিজড়িত স্বরে আপ্যায়িত করিবার জন্য ডাকিল—রমণী; ভাই! কেমন আছ?

রমণী কাতর কণ্ঠে উত্তর দিল,—আর কেমন কি ভাই! গেলেই হয়, রোগত আর আরাম হইল না?

প্রভাস। ছি—ওকথা কি বল্‌তে আছে, এবার আমি এসেছি—যত ভাল ভাল ডাক্তার আছে, সব দেখাইব, দেখি রোগ ভাল হয় কি না?' তারপর সে রক্তবর্ণ চক্ষে একবার গৌরীর প্রতি কটাক্ষ করিল। গৌরী, অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে। রমণীমোহন আর কথাবার্ত্তা না কহিয়া মধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিলেন। কি জানি, কি মনে করিয়া প্রভাস তখন আর কিছু র্ ি ল না।

৩৩

ভগীর মা বহুদিন হইতে রমণীমোহনের নিকট আছে। রমণীমোহন তাহাকে জননীর মত ভক্তি করেন; ভগীর মাও তাহাকে ছেলের মত স্নেহ করে। এক্ষণে রমণীর অবস্থা দেখিয়া এবং গৌরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে; কিসে রমণী নিরাময় হইবে, কিসে গৌরীর হাতের নোয়া, মাথার সিন্দূর অক্ষয় হইবে, এক্ষণে ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার কারণ হইয়াছে। এই জন্য সে গৌরীকে রমণীর সেবার জন্য রাখিয়া বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে রমণীর আরোগ্য কামনায় প্রাণের কাতর প্রার্থনা জানাইতে গিয়াছে।

মধ্যাহ্ন সময়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান করত ভগীর মা বাবার নিকট গিয়াছে, গৌরী স্বামীকে লইয়া বাসায় আছেন। প্রভাস মনে করিয়াছিল—গৌরী এইবার তাহার হইবে, তাহার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সে বহির্বাটীতে সমস্ত দিন, অতি সাবধানে অপেক্ষা করিয়াছে কিন্তু কই, তাহার আশা ত পূর্ণ হইল না, গৌরীত আসিল না, সে এখন অহরহঃ

স্বামীর কাছেই অবস্থান করিতেছে, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও তাকায় না। তাহারই বাড়ীতে থাকিয়া, তাহারই সাহায্যে জীবনধারণ করিয়া, তাহারই সঙ্গে প্রতারণা! উন্মত্ত প্রভাসের আর সহ্য হইল না। সে এইবার জোর করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিবে বলিয়া বদ্ধ পরিকর হইল।

প্রভাস বড় লোক, এ কার্য্যে তাহার সাহায্যকারীর অভাব হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভাস কামাতুর হস্তির মত সুরাপানে প্রভূত বল সঞ্চয় করিয়া আবার রমণীমোহনের গৃহে প্রবেশ করিল। গৌরী তখন শয্যা প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে শয়ন করাইতে ছিল; প্রভাস ও অপর দুইজন লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি শয্যাপার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভাস একথা সে কথার পর গৌরীকে বলিল—দেখ, তুমি কাল হতে কিছু খাও নাই, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে—খাইবে চল, বলিয়া মত্তাবস্থায় প্রভাস তাহাকে ধরিতে গেল, গৌরী লাফাইয়া সরিয়া গিয়া বলিল—প্রভাসচন্দ্র! সাবধান—আর এত আত্মীয়তাচ্ছলে আমাকে ভুলাইতে হইবে না, কে বলিল—আমি আহার করি নাই, তোমার কৃপায় আমি স্বামীর পদাশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি তাঁহারই পাদোদক পান করিয়া আহারের অপেক্ষাও তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তোমার মত পশুর হস্তে আমাকে আর আহার করিতে হইবে না। তুমি এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও, জগতে আমি আর কাহাকেও ভয় করি না. কেবল ভয় করি তোমাকে, তোমার মত কপট বন্ধু, পশু প্রকৃতি মাতালকে ভয় করি। তোমাকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণেশ্বরের প্রাণ বাঁচাইতে বিদেশে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া তুমি মনে করিয়াছ—আমার

সর্ব্বনাশ করিবে—এই শিবালয়ে দেবতার স্থানে আসিয়াও এরূপ ভীষণ পাপ করিতে তোমার প্রাণে ভয় হইতেছে না? ধনমদে মত্ত, সুরাপানে উন্মত্ত পাষণ্ড! আমার প্রাণের ধনের সর্ব্বনাশ করিয়া এখনও তোর তৃপ্তি হয় নাই? তিলে তিলে তাঁহার জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া মনে করিয়াছিল বুঝি তাঁহার কুললক্ষ্মীকে হস্তগত করিয়া পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিব! ধনের লোভ, বিষয়ের লোভ দেখাইয়া মনে করিয়াছিলি—বুঝি আমি তোর বশীভূত হইব! হাঁরে পাষণ্ড, সতীর ধনের অভাব কি? পূজনীয় স্বামী-দেবতার পূজা করিয়া ত্রিলোকের ইপ্সিত ধনে ধনী হইয়াছে; তুই তাহাকে কি ধনের প্রলোভন দেখাস্? ত্রিজগতে এমন মূল্যবান ধন কি আছে, যাহা সতী সতীত্ব বিনিময়ে প্রদান করিবে, আমি যে ধনে ধনবতী, স্বর্গের দেবীরাও যে তাহাতে লোভ করে, তবে তুই সামান্য পার্থিব ধনের লোভ দেখাইয়া আমাকে কেমন করিয়া ভুলাইবি? তুই কেবল স্বামীর বন্ধু বলিয়া এতদিন কিছু বলি নাই, আন্তরিক না হইলেও কপটভাবে তুই আমার অনেক উপকার করিয়াছিস্ বলিয়া এতদিন সব সহ্য করিয়াছি কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর না, আমি উমেশ কাকা আসিলে আজি স্বামীকে লইয়া তোর এ পাপ আশ্রয় ত্যাগ করিব, এক্ষণে তুই আমার সম্মুখ হইতে দূরহ!

শীকার হস্তচ্যুত হইয়া পলাইবে শুনিয়া প্রভাস অধৈর্য্য হইয়া বলিল —সে কি ভাই, গৌরী! এত আশা দিয়া নৈরাশ করা কি তোমার ধর্ম্ম, এস, এস গৌরীরাণী, বলিয়া সে যেমন তাহাকে ধরিতে যাইবে—অমনি গৌরী কোটাদেশ হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলেন—পাষণ্ড, আর একপদ অগ্রসর হইয়াছ কি এ শাণিত ছুরিকা তোমার

বক্ষভেদ করিবে। মনে করিয়াছিলাম—নিজেই সাবধানে আত্মরক্ষা করিব—কপট বন্ধু হইলেও তোমার প্রতি হিংসা করিব না. কিন্তু তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে তোমার মত পাষণ্ডকে উপযুক্ত শাস্তি না দিলে, শুধু আমার কেন, ভবিষ্যতে আরও কত অসহায় সতীর সর্ব্বনাশ করিবে, সেজন্য আজ দেবতার সম্মুখে তোমার মত নরপশুকে বলিপ্রদান করে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অটুট রাখিব।

সতীর তেজ দিগন্ত বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল, যেন দানবদলনী, নৃমুণ্ড-মালিনী ভীমা ভয়ঙ্করী মহাশক্তি আজ কৃপাণ করে দানব দলনে উদ্যতা, মাথার বসন খুলিয়া গেল, রুক্ষ কেশপাশ বায়ুভরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—রক্তবর্ণ চক্ষু বিঘূর্ণীত হইতে লাগিল—সে রণচণ্ডী মূর্ত্তি! দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে কিন্তু সুরায় বিকৃত মস্তিষ্ক প্রভাস একেবারে উন্মত্ত; সে ক্ষোভে অপমানে আত্মহারা হইয়া ডাকিল—করিম, রহিম! আমারই আশ্রয়ে থাকিয়া আমারই অপমান, বাঁধ হারামজাদিকে, আর ওর রুগ্ন স্বামীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল—দেখি, ওর কোন্ দেবতা-বাবা ওকে রক্ষা করে!

করিম ও রহিম দুইজন মুসলমান, পানোন্মত্ত হইয়া এই পাপ কাজের জন্য আসিয়াছিল, গৌরীকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রভুর আহ্বান শুনিয়া যেমন তাহারা গৃহ প্রবেশ করিয়া গৌরীকে সবলে আকর্ষণ করিবে—ঠিক সেই সময়ে "দুর্বৃত্ত পশু স্থির হ, তোদের শেষ সময় উপস্থিত" বলিয়া একজন যুবক সন্ন্যাসী দন্ত কড়মড় করিয়া দ্রুতগতি তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, সঙ্গে ভীষণ লাঠি হস্তে একজন যম-

দূতাকৃতি পাইক, পরক্ষণেই একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মালতী সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—কই ! পাষণ্ড প্রভাস তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে বন্ধন কর ! বলিবামাত্র উমেশ ও যুবা সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দামু তাহাদের বন্ধন করিয়া নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। গৌরী তখন মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যুবক সন্ন্যাসী পাইকে জল আনিতে বলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করত বলিলেন—গৌরী ! মা, ভগবতী যাহার সহায়, সতীত্ব বলে যে মাকে বশীভূত কর্ত্তে পেরেছে, ত্রিজগতে তাহার অনিষ্ট করিবার সাধ্য কার আছে ? মা—ধন্য তুই, তোরই সতীত্বতেজ সার্থক, যথার্থ পতিব্রতা সতী না হইলে, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সার ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলে, এত প্রলোভনে এতকষ্টে কেহই আত্মরক্ষা, করিতে পারে না—মা ! ধন্য তোর পতিপ্রেম, উঠ মা ! অত্যাচারীর দুর্দ্দশা দর্শন কর !

একাকিনী গৌরী ভয়বিহ্বল হইয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—মুর্চ্ছান্তে দেখিলেন—একি ! তাঁহার চিরদিনের বন্ধু সকলেই যে এখানে উপস্থিত ! তাঁহার জননীর চির সহায় সর্ব্বত্যাগী দামুদাদা, তাহার চির প্রতিপালক দামু মামা যে আজ তাহাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন—আর ভীষণ লগুড় হস্তে উমেশকাকা যে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে জল সেচন করিতেছেন, আর ঐ যে প্রাণের সঙ্গিনী মালতী, অদূরে দাঁড়াইয়া কিন্তু ঐ জ্যোতির্ম্ময় সাধন তেজে তেজীয়ান, দ্বিতীয় ভাস্কর স্বরূপ মহাপুরুষ উনি কোথা হইতে আসিলেন ! গৌরী তাড়াতাড়ি মামার কোল হইতে উঠিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভূ ! কে আপনি, জনম দুঃখিনী কন্যাকে এ সঙ্কটে রক্ষা করিলেন।

সেদিন ত্রিলোকময়ীর মন্দির হইতে ফিরিবার সময় দামুঘোষের ভ্রুকুটী ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মালতী পূর্ব্ব হইতেই অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল। দামু যখন প্রভাসের মস্তকে লাঠি চালাইল, অন্ধকারে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সে যখন পলায়ন করিল, দামু তখন মালতীকে বলিল—স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের পরম ধন সতীত্ব হরণে সহায়তা করিতেছ, অতএব তোমাকেই শমনসদনের অতিথি করি এসো, বলিয়া যেই তাহার মাথায় আঘাত করিতে যাইবে অমনি মালতী পদে ধরিয়া রোদন করিল, স্ত্রীজাতি অবোধ্য বলিয়া দামুর দয়া হইল, তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া সৎ উপদেশ দানে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছেন। মালতীর চরিত্র ফিরিয়াছে, সে এখানে আসিয়া প্রত্যহই শিবের পূজা করে, আর দেবানন্দের আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে। কয়েক দিন পূর্ব্বে ভগীরমার সহিত দেখা হইয়া সে সমস্ত শুনিয়াছিল, প্রভাসের গুপ্ত অভিসন্ধির প্রতি প্রখর নজর রাখিয়াছিল। আজ তাহারই ঐকান্তিকতায় গৌরীদেবী এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দেবানন্দ বলিলেন—মা! তুমি আমাকে তত চিনিতে পারিবে না, আমি ও দামু চিরদিনই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, আজ মালতীর মুখে তোমার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছি। চল দেখি, রমণী আমার কেমন আছে?

রমণীমোহনের উত্থান শক্তি থাকিলে তিনি গৌরী প্রতি পাষণ্ডের আক্রমণ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন না—নিজের প্রাণ যতক্ষণ, ততক্ষণ আততায়ীর বিনাশ সাধনে প্রাণপণ করিতেন কিন্তু তিনি যে মৃতকল্প, পাষণ্ড যে তাঁহাকে অগ্রেই মৃত্যুর কবলশায়ী করিয়া গৌরীকে একেবারে

নিরাশ্রয়া করিয়া ফেলিয়াছিল,—পাষণ্ডের অত্যাচার দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ভীষণ আঘাত পাইয়া ডাকিয়াছিলেন—মা! পশুহননের এইত সময় মা, দানবদলনীরূপে অবতীর্ণা হও, বলিয়া মুমূর্ষু প্রাণের দারুণ উত্তেজনায় চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ দেবানন্দের পবিত্র হস্তের সুশীতলস্পর্শে সচেতন হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল, কম্পান্বিত ক্ষীণ হস্ত তুলিয়া নমস্কার করত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—প্রভু! পদধূলি দিন, পীড়িত হইয়া আমার জাহানাবাদের হাকিমী গিয়াছে, কেবল আপনার সেই মনোমুগ্ধকর উপদেশবাণী এখনও এ মুমূর্ষু প্রাণকে উত্তেজিত করিতেছে—"ধর্ম্মপথে জয় চিরদিন"। তাই এখনও এ দেহে প্রাণ আছে; আর আজ সেই জন্যই প্রাণের গৌরী আমার এ ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তি-লাভ করিল। তার পর দামুঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞতানেত্রে চাহিয়া বলিলেন—ভাই দামু! তুমি নরাকারে দেবতা; তোমার এত গুণ না থাকিলে কি এই মহাপুরুষের এত প্রিয় হইতে পার? জাহানাবাদে যখন ইনি শিষ্য বাড়ী ছিলেন, তখন আমি প্রত্যহ ইঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে যাইতাম কিন্তু কই, তোমাকে ত একদিনও সেখানে দেখি নাই?

দামু।—ভাই; আমি স্বকার্য্যে থাকিয়াও চিরদিন অলক্ষ্যে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছি। সে দিন ত্রিবেণীর মন্দিরপথে গৌরী সহিত দেখা হইয়াছিল কিন্তু সে আমায় চিনিতে পারে নাই। তারপর মালতীর মুখে গৌরী ও তোমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া গুরুদেবসহ আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভয় নাই—দুর্দ্দিন কাটিয়াগিয়াছে, ভগবান কেবল পরীক্ষার জন্য তোমাদের বিপদে জড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা পরীক্ষায়

সর্ব্বজয়ী হইয়াছ, তাই মেঘমলিতা কাটিয়া আবার ভাগ্য-গগণে সুখ-সূর্য্যের উদয় দেখিয়া সুখী হইবে।

৩৪

নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইলে মানুষ নববলে বলীয়ান হয়। দেহ যার পর নাই ক্ষীণ, প্রাণের স্পন্দন যারপর নাই দুর্ব্বল হইলেও রমণী-মোহন আজ বহুদিনের পর শয্যার উপর স্বয়ং ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। গৌরী পদতলে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে আসিয়া গৌরীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—দিদি! এখন না হউক; প্রথমে টাকার লোভে আমিও তোমার অসীম অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সে দিন দারুকেশ্বর নদী-তীরে এই মহাপুরুষের তীব্র তাড়নায় আমি কুপথ ছাড়িয়া সুপথে আসিয়াছি, আজ বৈদ্যনাথ ধামে বুড়ীগঙ্গার ঘাটে ভগীরমার নিকট তোমার প্রতি প্রভাসের অত্যাচারের কথা শুনিয়া ইঁহাদের কাছে প্রকাশ করত প্রতিকারের প্রার্থনা করি; দিদি! দরিদ্র আমি, টাকার লোভে পড়িয়া যাগ করিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমার মার্জ্জনা কর!

গৌরী বলিলেন—আমার নিজস্ব ক্ষমতা কিছুই নাই, তবে দেবতার পদে মতি রাখিয়া আজ তোকে ক্ষমা করিলাম—তুই যে ভিতরে ভিতরে থাকিয়া, প্রভাসের সঙ্গে বিপথে ঘুরিয়া আজ সুপথে আসিয়াছিস্ তজ্জন্য দেবতা তোর মঙ্গল করুন। মালতী রমণীমোহনেরও পদধূলি লইল।

এইবার পাষণ্ড প্রভাস ও তাহার সঙ্গী দুই জনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া

অভিষিক্ত করিতে পারিস্, তাহা হইলে এ যাত্রা যদি তোর মুক্তিলাভ হয়, প্রাণে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারিস, নতুবা আর অন্য উপায় নাই।

প্রভাস ধীরস্থির হইয়া সন্ন্যাসীর সেই তীব্র উপদেশ পূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছিল, পরিণাম ভাবিয়া তাহার প্রাণ দরু দরু কাঁপিয়া উঠিতেছিল, ভগবানের এ পূণ্যময় রাজত্বে তাহার মত মহাপাপীর স্থান নাই ; তাই মা ধরিত্রী যেন তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

অনুতাপের পবিত্র অশ্রুজলে পাপীর অপবিত্র হৃদয় যখন ধৌত হয়, পাপের মেঘমলিনতা যখন একটু একটু করিয়া কাটিয়া হৃদয় গগনে চৈতন্য চন্দ্রের উদয় হয়, জ্ঞান-গঙ্গা যখন তাহার সমস্ত আবিলা আবর্জ্জনা, মলামাটী ধৌত করিয়া খাঁটী করিয়া দেন ; তখন সে মহাভাবনায় বিভোর হইয়া জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে মাতৃসত্ত্বা অনুভব করত জগৎ মামঃ দেখিয়া চরিতার্থ হয়। মহাপুরুষ দেবানন্দের প্রেমের আকর্ষণে প্রভাসের প্রাণ নূতনভাবে নূতন সাজে সাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ডঙ্কার নাদের মত মাতৃনিনাদের সুধামাখা মা মা শব্দ তাহার প্রাণ মন বিমোহিত করিয়া তুলিল। প্রভাস আবেগভরা কণ্ঠে, ভক্তিভরা প্রাণে, চক্ষে দর বিগলিত ধারে প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে মা মা রবে দৌড়িয়া আসিয়া গৌরীর পা জড়াইয়া বক্ষে ধারণ করত বলিল—গৌরী দেবী, ক্ষমাময়ী সতী সিমন্তিনী মা, অধম অবোধ সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর ; ক্ষমা কর দেবি ! তোমা ভিন্ন আমার এ পাপের মুক্তিদাত্রী আর কেহ নাই ! বলিয়া ধূলায় পড়িয়া লুঠাইতে লাগিল।

গৌরী শশব্যস্তে পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া হাঁ। হাঁ। কর কি প্রভাস !

আমার পরমদেবতা স্বামী নিকটে থাকিতে, আমার আরাধ্য দেবতা সর্ব্বানন্দ, পূজনীয় মাতুল মহাশয় আর এই ভদ্র মহোদয়গণ থাকিতে তোমাকে আমার ক্ষমা করিবার অধিকার কি আছে ?

প্রভাস তথাপি পা ছাড়িল না, সজোরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না গৌরী ! আমি দেবতার মঙ্গল ঘটে পদাঘাত করিয়াছি ; মন্মথ-শরাশন সংবিদ্ধ হইয়া পবিত্র দেবিমূর্ত্তি কলঙ্ক-কটাক্ষে অবলোকন করিয়া পাপের জ্বলন্ত আগুণে পুড়িয়া মরিতেছি—তুমি মাতৃমূর্ত্তি, অভয় দায়িণী, শান্তিময়ী দেবী প্রতিমা, তুমি ক্ষমা না করিলে আমি জগতের কোথাও শান্তি পাইব না—মা মা অধম সন্তানকে ক্ষমা কর।

গৌরী অভয়দায়িণী ভগবতী মূর্ত্তিতে জননীর মত পরম পবিত্র সুশীতল কর প্রসারণে প্রভাসকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন—আমি এই মুক্তিদাতা দেবতাগণের সম্মুখে প্রভাস তোমাকে ক্ষমা করিলাম ! আজ হইতে পবিত্র ধর্ম্মময় প্রাণে জগতের নিকট আদর অপ্যায়ন পাইয়া তুমি সন্তাপিত প্রাণ সুশীতল কর।

প্রভাস তাঁহার পদধূলি লইয়া রমণীমোহনের পদতলে আকুল প্রাণে উপস্থিত হইয়া আবেগভরা ধরা ধরা গলার ভরা আওয়াজে বলিল—ব্রাহ্মণ ! আজ আমার মত পাপী আর তোমার মত পবিত্র চিত্ত সাধুকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে সক্ষম নয়, তাই বলি ব্রাহ্মণ ! এই পতিত অধমকে ক্ষমা কর। রমণী এতক্ষণ এ ধর্ম্মময় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে প্রভাসকে পদতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—প্রভাস ! ভাই আমার ; মানুষের ভ্রম পদে পদে, তুমি যে এক্ষণে ভ্রম সংশোধন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট,

করিয়া বুঝাইতে হইবে—"নচ দৈবাৎ পরম বলং" দৈবই যে দুশ্চিকিৎস্য রোগের মহৌষধী, এ কথা কেন ভুলিয়া যাইতেছ মা ! গৌরী দেবানন্দের পদধূলি লইয়া স্বামীর মস্তকে প্রদান করিলেন। পরদিন তাঁহারা সকলে এই মহাপুরুষের সিদ্ধাশ্রম ত্রিকুট পাহাড়ের শান্তিময় তপোবন "দেবানন্দ আশ্রমে" গমন করিলেন।

শান্তিময় তপোবন- "দেবানন্দ আশ্রমের" সেই শান্তিময় দৃশ্য, সেই প্রাণারাম হিংসা দ্বেষ বিবর্জিত ব্রহ্মভাব সন্দর্শন করিয়া রমণীমোহন দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এতদিনের পর এখানে আসিয়া তাঁহার প্রকৃত বায়ু পরিবর্ত্তন হইল, তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আর গৌরী দেবী মালতীর সহিত প্রতিদিন বুড়ীগঙ্গায় স্নান করিয়া ভক্তিভাবে বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করতঃ স্নানজল লইয়া স্বামীকে পান করাইতেন—তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতেন—এই অমোঘ ঔষধে রমণীমোহন পুনরায় নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন। একবৎসর অজস্র টাকা খরচ করিয়া নানাবিধ চিকিৎসায় যাহা হয় নাই—আজ ভগবান বৈদ্যনাথের চরণামৃত পানে একমাসের মধ্যে রমণীমোহন পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইলেন। বায়ু পরিবর্ত্তন মনের পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে,সাংসারিক চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সুদৃশ্যময়ী প্রকৃতি মায়ের কোলে শুইয়া মন ধর্ম্মভাবে বিভোর করিলেই প্রকৃত বায়ু পরিবর্ত্তন করা হইল।

রমণীমোহন দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন প্রাতঃকালে সস্ত্রীক বুড়ীগঙ্গায় স্নান করত বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করিয়া তাঁহার মৃতসঞ্জিবনী সুধা স্বরূপ পাদোদকপান করেন, পদব্রজে কয়েক ক্রোশ পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া তপোবনে আগমন করেন। তারপর গৌরীদেবীর পবিত্র হস্তের

প্রস্তুত সাত্ত্বিক আহার পরিতোষের সহিত ভোজন করত সমস্তদিন মুক্ত-পুরুষ দেবানন্দের নিকট শাস্ত্র কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৈহিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি করিতে লাগিল—তাঁহার দেহ কান্তি পুষ্ট হইতে লাগিল—তিনি সকল ব্যাধিমুক্ত হইলেন।

তারপর আরও কিছুদিন মহাপুরুষের পদতলে অবস্থান করিয়া তাঁহারই আদেশে দেশে আসিয়া তিনি আবার তাঁহার পূর্ব্ব পদে অভিষিক্ত হইবার জন্য সরকারে দরখাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত ন্যায়বান কর্ম্মদক্ষ হাকিমের রোগমুক্তির সংবাদ পাইয়া সরকার বাহাদুর আনন্দের সহিত তাঁহাকে পুনরায় হাকিমী পদ প্রদান করিলেন সংসারে সুখের পড়তা পড়িলে চারিদিকেই সুখের স্রোত বহিতে থাকে; গৌরীদেবী অচিরে তাঁহার প্রেমব্রতের পুরস্কার স্বরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্ররত্ন লাভ করিয়া স্বামীর প্রেমঋণের আদান-প্রদান করিলেন। কিন্তু শ্বশুর শাশুরীর জন্য রমণীর প্রাণ সময়ে সময়ে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিত, তিনি গৌরীকে বলিতেন—গৌরী! আমরা এমন হতভাগ্য যে সে দেব দেবীর অন্তিম সেবা করিতে পারিলাম না।

রমনীমোহন সুস্থদেহে স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুখ্যাতির সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া অবসর সময়ে বন্ধু প্রভাসের জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করত মহাপুরুষ দেবানন্দের দ্বারা তাহার আয়ের সদ্ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভগীরমা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী হইয়া রহিল। আমাদের আখ্যায়িকাও এইখানে শেষ করিয়া আমরা অদ্যকার মত পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

সমাপ্ত।